খাসায়েলে মুস্তফা

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম

মূল

gdZx mjvBgvb Kv‡mgx mvnvivbcix

অনুবাদ

gdZx g¯‘dRi ingvb Kv‡mgx

মুহাদ্দিস, জামিয়া রশীদিয়া এনায়েতুল উলূম দক্ষিণখান, উত্তরা, ঢাকা

খতীব, বাবলী জামে মসজিদ, তেজগাঁ শিল্প এলাকা, ঢাকা

প্রকাশনা

dL‡i ev½vj cvewj‡KkÝ XvKv

১৮৪ তেজগাঁও শিল্প এলাকা, ঢাকা-১২০৮

www.almodina.com

ঐতিহ্যবাহী দারুল উলূম দেওবন্দের প্রধান মুফতী ফকীহুল উম্মত হযরত মাওলানা
মুফতী মাহমূদুল হাসান গাঙ্গুহী (রহঃ)-এর

evYx I †`vqv

নাহ্মাদুহু ওয়ানুসাল্লি আলা রাসূলিহিল কারীম! আম্মা বা'দ! মাওলানা মুফতী মুহাম্মদ সুলাইমান কাসেমী সাহারানপুরী-এর কিতাব 'খাসাইলে মোস্তফা সা.'-এর কথা শুনে আনন্দে মন আত্মহারা হয়ে গেছে। আল্লাহ তা'আলা তাঁর এ শ্রম-সাধনা কবুল করে নিন এবং তাঁকে এর যথাযথ প্রতিদান দান করুন। আমীন।

ev›`v gvng` (¸wdivjvû)
ছাত্তা মসজিদ
দারুল উলূম দেওবন্দ
২১/১১/১৪১২ হিজরী

বিশ্ববরেণ্য আলেমে দীন মুফাক্কিরে ইসলাম, আল্লামা সাইয়্যেদ
আবুল হাসান আলী মিয়া নদভী (রহঃ)-এর

evYx I †`vqv

প্রিয় মাওলানা! সালাম নিবেন! আপনার চিঠি ও 'খাসায়েলে মোস্তফা' নামক কিতাবখানা পেয়েছি। আপনিতো একটি চমৎকার বিষয়বস্তুকে নির্বাচিত করেছেন এবং কিতাব লিখেছেন। মাশাআল্লাহ! এমন বরকতময় কাজ করতে পারায় সর্বপ্রথম আমার পক্ষ থেকে অসংখ্য মোবারকবাদ গ্রহণ করুন। আমি প্রাণভরে দোয়া করি, মহান আল্লাহ আপনার এই অসাধারণ কাজটি কবুল করে নিন। বর্তমানে আমার শারীরিক অবস্থাটা বেশী ভাল না থাকায় অধিক কিছু লেখা সম্ভবপর হয়ে উঠছে না। তা নাহলে এমন একটি কিতাবের ব্যাপারে কিছু লিখে নিজেকে ধন্য করতাম এবং কল্যাণ ও বরকতের মাধ্যম হিসেবে গ্রহণ করতাম।

ওয়াস্‌সালাম
দোয়া প্রার্থী
আবুল হাসান আলী আল হিসনী আন নদভী
নদওয়াতুল উলামা লক্ষ্ণৌ, ভারত

ঐতিহ্যবাহী দারুল উলূম দেওবন্দের শায়খুল হাদীস, ফখরুল মুহাদ্দিসীন
পরম শ্রদ্ধাভাজন উস্তায আল্লামা আলহাজ্ব
Ave`j nK Avhgx (`vt evt)-Gi

†`vqv I gj¨vqb

উক্ত কিতাব “খাসায়েলে মোস্তফা” নবী আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দেহ গড়নের এবং দিবানিশির আমলসমূহে তাঁর অভ্যাস চরিত্রের ব্যাপারে এক পরিপূর্ণ কিতাব। যা স্নেহধন্য ছাত্র মাওলানা সুলাইমান কাসেমী সাহারানপুরী অত্যন্ত মেহনত করে নির্ভরযোগ্য কিতাবাদির উদ্ধৃতিসহ সুবিন্যস্তভাবে রচনা করেছেন। আমি তা শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত প্রত্যেকটি বিষয় মনযোগ সহকারে লেখক কর্তৃক পড়িয়ে শ্রবণ করেছি। কোথাও কোথাও প্রয়োজনমত সংযোজন-বিয়োজনের পরামর্শ দিয়েছি। লেখক তা সানন্দে গ্রহণ করেছেন।

আলহামদুলিল্লাহ! আমার দৃষ্টিতে এই কিতাব সীরাতে নববী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর বিঘোষিত হাদীসসমূহের এক চমৎকার ও প্রমাণপুষ্ট সমাহার। যা প্রত্যেকটি নবী প্রেমিকের জন্য সমান উপকারী। এই কিতাবের আরেকটি বৈশিষ্ট্য এই যে, নবী পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতিটি আমলের বিবরণের ক্ষেত্রে পৃথক পৃথক শিরোনাম কায়েম করা হয়েছে। যাতে শিরোনাম দেখেই মূল আলোচ্য বিষয়ের প্রতি মোটামুটি ধারণা হয়ে যায়। আর পাঠকদেরকে তা আমলে পরিণত করতে সহায়ক ভূমিকা রাখতে সক্ষম হয়। সেই সাথে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র দেহ গঠনের বর্ণনার ক্ষেত্রে বিষয় ভিত্তিক কবিতা, যা মাওলানা ক্বারী আবদুস সালাম হানসুরী (মুযতার হানসুরী)-এর রচিত কিতাব “হুলিয়াতে নবীয়ে আকরাম সা.” থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে। যদ্দরুন কিতাবের শোভা আরো বর্ধিত হয়েছে।

আমি দোয়া করি! আল্লাহ তা‘আলা এই কিতাবকে তাঁর একান্ত অনুগ্রহে কবুল করে নিন। লেখক, অনুবাদক, পাঠক সকলকে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র সীরাত-এর উপর আমল করার তওফীক দান করুন। লেখকের অন্যান্য দীনি খেদমতসমূহ কবুল করে নিন। তাঁকে উভয় জগতে সকল বিষয়ে বরকত দান করুন। আমীন। ইয়া রাব্বাল আলামীন।

বান্দা আবদুল হক
খাদেম দারুল উলূম দেওবন্দ
৫ই জুমাদাল উলা ১৭১৬ হিজরী

আল্লামা ফখরে বাঙ্গাল (রহঃ) ও রঈসুল মুফাসসিরীন হযরত বড় হুজুর (রহঃ)-এর স্থলাভিসিক্ত, ফিদায়ে মিল্লাত আওলাদে রাসূল সৈয়দ আসআদ মাদানী (রহঃ)-এর সুযোগ্য খলীফা, ঐতিহ্যবাহী জামিয়া ইউনুসিয়া-এর মুহতামিম, শাইখুল হাদীস ও প্রধান মুফতী পীরে কামেল

Avjvgv AvjnvR nhiZ gvI jvbv gdZx bi“jvn mv‡ne

দামাতবারাকাতুহুমুল আলিয়া-এর মূল্যবান

evYx I `Av

হযরত অত্যন্ত অসুস্থ ও দুর্বল থাকা সত্ত্বেও ‘খাসায়েলে মুস্তফা সা.’-এর কথা শুনে বাসা থেকে মাদরাসার অফিস কক্ষে কষ্ট করে তাশরিফ আনলেন। অত্যন্ত আগ্রহভরে বইয়ের বিশেষ বিশেষ অংশ পড়লেন। ভাবলেন। এক পর্যায়ে তা উঠিয়ে চুমু খেলেন। আবেগাপ্লুত হয়ে চোখে মুখে লাগালেন। বললেন, ‘খাসায়েলে মুস্তফা সা.’ তো আমার চোখের জ্যোতি। এরপর কলম হাতে নিয়ে কাঁপা হাতে নিজেই লিখে দিলেন উপরোক্ত অভিমতখানি। তাই বরকত মনে হযরতের স্বহস্তের লিখাটুকু হুবহু তুলে দেওয়া হল। —অনুবাদক

কুতুবুল আলম, শাইখুল আরব ওয়াল আজম, আকাবিরে দেওবন্দের মূর্ত প্রতীক, মুহিউস সুন্নাহ, শায়খে তরীকত

Av j vgv kvn Rgx i DÏxb (cxi mv‡ne bvbci)-Gi

`Av I evYx

হামদ ও সালাতের পর আল্লাহ তা'আলা গোটা বিশ্বজগত জ্বিন ইনসানকে একমাত্র তাঁর ইবাদত করার জন্যই সৃষ্টি করেছেন। আল্লাহ তা'আলার ইবাদত করার মাধ্যমেই তাঁর ভালবাসা অর্জন করা সম্ভব। আর আল্লাহপাক ঘোষণা করেছেন, হে নবী! আপনি উম্মতদের বলে দিন, যদি তোমরা আমাকে ভালবাসতে চাও, তাহলে তোমরা আমার অনুসরণ কর। এই আয়াত দ্বারা পরিস্কার বুঝা যাচ্ছে যে, প্রকৃতপক্ষে নবীজি (সা.)-এর বাস্তব অনুসরণের মাধ্যমেই বান্দা আল্লাহকে পেতে পারে। নবীজির অনুসরণ-অনুকরণ ব্যতীত অন্য যে কোন উপায়ে আল্লাহর ভালবাসা অর্জনের চেষ্টা করা কিংবা দাবী করা এবং নবীজির সুন্নতের অনুসরণ হতে নিজেকে বিরত রেখে আশেকে রাসূল বা নবী প্রেমিক দাবী করা, তা ভন্ডামী, প্রতারণা, নব্য ইয়াহুদী-নাসারাদের দালালীর নামান্তর।

নবীজিকে ভালবাসতে হলে তাঁর আদর্শ ও সুন্নত মুতাবেক স্বীয় জীবন গড়ে প্রকৃত প্রেমিক হতে হলে নবীজির হুলিয়া, বৈশিষ্ট্য ও শামায়েল সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করা আকশ্যক। অতীতকাল হতে ঈমাম তিরমিযী (রহঃ)সহ অনেক মনীষীরাই নজীবির চরিত্র শামায়েল, বৈশিষ্ট্য নিয়ে তথ্যবহুল পুস্তক রচনা করেছেন। এরই ধারাবাহিকতায় মাওলানা সুলাইমান কাসেমী রচিত 'খাসায়েলে মুস্তফা সা.' বইটি উর্দু ভাষায় রচিত। বাংলা ভাষী পাঠকদের জন্য নবীন আলেম ও মুহাদ্দিস মাওলানা মুস্তাফীজুর রহমান বাংলায় অনুবাদ করে জাতির বিশাল খিদমত আঞ্জাম দিয়েছেন। তাই আমি তাকে আন্ত রিক মোবারকবাদ জানাই। কিছুদিন পূর্বে আমার আযীয নবীন আলেম মুফতী সুলতান আহমদসহ আরো ক'জন দোস্ত-আহবাব একত্রিত হয়ে রহিম মেটাল মসজিদের ইসলামী মহাসম্মেলনে বইটির অনুবাদ কপি আমাকে দেখায়। তা দেখে আমি আন্তরিকভাবে খুশি হয়েছি। অনুবাদকসহ সংশ্লিষ্ট সকলের জন্য প্রাণ খুলে দুআ করছি।

আমি বইটির সর্বাঙ্গিন প্রচার-প্রসার কামনা করছি। পাশাপাশি অনুবাদকের সফলতা কামনা করে তাঁর এই নিরলস খেদমত কবুলের জন্য আল্লাহ পাকের নিকট দুআ করছি। আমীন।

Av j vgv kvn Rgx i DÏxb (cxi mv‡ne bvbci)
মহাপরিচালক, জামিয়া ইসলামিয়া ওবায়দিয়া,
নানুপুর, ফটিকছড়ি চট্টগ্রাম

DrmM

উসতাযে মুহতারাম, মুজাহিদে মিল্লাত
Avjvgv kvgmÏxb Kv‡mgx (int)-Gi
সান্নিধ্যধন্য মুহূর্তগুলোর স্মরণে
ও
gvei“iv gvnRweb iw `qv-এর
সার্বিক সুস্থতা, হায়াতে তাইয়েবা
ও উজ্জ্বল ভবিষ্যত কামনায়-

wØZxq ms¯‹i‡Yi Awfe¨w³

আলহামদু লিল্লাহ ! সম্মানিত পাঠকবৃন্দের অন্তহিন ভালবাসা ও সহযোগীতায় “ফখরে বাঙ্গাল পাবলিকেশন্স ঢাকা” তার লক্ষ পানে মহান ছুটে চলছে সগৌরবে । ইতিমধ্যে এর প্রকাশিত দুটি বই পাঠকমহলে ব্যাপক সাড়া জাগাতে সক্ষম হয়েছে, প্রত্যাশার চেয়েও দ্রুত প্রথম এডিশন শেষ হয়ে গেছে । বিশেষ করে দ্বিতীয় বইটিতো প্রকাশের ৩য় মাসেই শেষ! একবারে হাতে হাতে কাড়াকাড়ি! এর পর পরবর্তি এডিশন ছাপানোর তাকিদ,অনুরোধ,চাহিদা ও প্রত্যাশার চাপ অনবরত আসতে থাকে । কিন্তু! নতুন কয়েকটি বইয়ের কাজ হাতে থাকায়, এছাড়াও আরো কিছু কাজের চাপ ধাকায় ২য় এডিশনের কাজটা সময় মত করতে না পেরে আমি আন্তরিকভাবে দুঃখিত । আশা করি ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে দেখবেন । আর সম্পর্কের এই সেতুবন্ধন, যোগাযোগটুকু অটুট রাখবেন । আপনাদের এতটুকু খেদমত করার সুযোগদানের জন্য কিভাবে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করব ভেবে পাচ্ছিনা । আলহামদু লিল্লাহ! ছুম্মা আলহামদু লিল্লাহ! আপনাদের প্রিয় প্রতিষ্ঠান ‘‘ফখরে বাঙ্গাল পাবলিকেশন্স ঢাকা” । এর সকল অগ্রযাত্রার পুরো কৃতিত্ব আপনাদেরই । সেই সাথে এর সবটুকু সওয়াব নিবেদন করতে চাই আমার মরহুম আব্বা আম্মা সহ সেই মহান বুযুর্গ “ফখরে বাঙ্গাল” আল্লামা তাজুল ইসলাম (রাহঃ) এর রূহ মোবারকে, যার সংগ্রামী জীবনভিধানে পরাজয় জাতীয় কোন শব্দ ছিলনা । মহান আল্লাহর খাছ কুদরদে বিস্ময়কর ভাবে সফল হয়েই আসতেন যে কোন শক্ত প্রতিপক্ষের উপর । যে কোন বাতিলের উপর তার প্রভাব, প্রতাপ পরত মোমের উপর আগুনের মত । ইসলামের নামধারী যে কোন বাতিল ফের্কার বিরোধ্যে তর্ক যুদ্ধে তিনি অনেক বিজয় মাল্য ছিনিয়ে এনেছেন । সফলতার বহু সৃঙ্গে তিনি আহরণ করছেন, তার উন্নত মমশীরে বহুবার শোভা বর্ধন করেছে ইসলামের বিজয় মুকুট/তাজ । কেননা তিনি নিজেই তো ছিলেন ইসলামের তাজ (তাজুল ইসলাম) ।

সুধীবৃন্দ! জগৎ বিখ্যাত তুখোর ধীমান সিংহ পুরুষের অমর কীর্তি আজ যে কাওকেই মুগ্ধ, আকর্ষিত করে । বিস্ময়কর প্রতিভার সক্ষর ও আলৌকিক খোদায়ী সাহায্যের সমন্নিত তাঁর অসংখ্যা কারামত সমূহ থেকে একটি আমাদের এ প্রজন্মের পাঠকদের উদ্দেশ্যে তুলে ধরছি ।

তখন তিনি দারুল উলুম দেওবন্দের সবোর্চ্চ ক্লাসের ছাত্র । বার্ষিক পরিক্ষাও চলছে । এমন সময় ইংরেজপুষ্য ভন্ডনবী কাদীয়ানীদের সাথে মুসলমানদের বাহাস (তর্ক যুদ্ধ) অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা । মুসলমান তর্কবাগিসগণ দারুল উলুম দেওবন্দের মুহাতামিম সাহেবের নিকট দোয়া নিতে আসলে হুজুর তাদেরকে বললেন যে যাও, তবে তাজুল ইসলাম বাঙ্গালীকে সাথে নিয়ে যেও, হয়ত তার প্রয়োজন পরতে পারে । হুজুর মুরুব্বী মানুষ, তাই তাঁর কথা রক্ষার্থে তাজুল ইসলাম বাঙ্গালীকেও তাঁদের সাথে নিয়ে গেলেন । বাহাস যথারীতি আরম্ভ হল । উভয় পক্ষের পাল্টাপাল্টি প্রশ্নোত্তরে দারুণ জমে উঠল । মুসলমান দক্ষ তর্ক বাগীসদের কৌশলিক বাগ্মিতায় একপর্যায়ে কাদিয়ানীরা ধরাশায়ী হয়ে আসছিল প্রায় । এমন সময় ভণ্ডরা তাদের শেষ অস্ত্রটাও প্রয়োগ করল । অর্থাৎ তাদের দীর্ঘ দিনের চেষ্ঠা সাধনায় বহু ভাড়াটে মৌলভীদের দ্বারা রচিত আরবী কবিতার পান্ডলিপিটা পড়ে শুনাতে লাগল, আর বলতে লাগল যে, গোলাম আহম্মদ কাদীয়ানী যে সত্য নবী এর প্রমান হলো এই আসমানী গ্রন্থ (?) যা তার উপর আল্লাহতায়ালা অহীর মাধ্যমে নাযিল করেছেন (নাওযুবিল্লাহ) । যদি তোমরা তা মিথ্যা প্রমান করতে পার তাহলে এই মুহুর্তে এর মত ছন্দ মিলিয়ে গ্রন্থ রচনা করে দেখাও । আর যদি তা না পার তাহলে গোলাম আহমদ কাদিয়ানীকে নবী মানতে হবে । এই চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিয়ে তারা মহাউল্লাস করতে লাগলো, তাদের বিশ্বাস ছিলো যে এর জবাবতো মুসলমানরা কিছুতেই দিতে পারবেনা । “নগদ কবিতার ছন্দে কিতাব রচনা করে এর জবাব দেয়া চাট্টিখানি কথা?” মুসলমান তর্কবগীসগণ তো একথা শুনে কিংকতর্ব্য বিমুড় হয়ে গেলেন । পিনপতন নীরবতা নিমে এলো মুসলমান দর্শক, শ্রতাদের মাঝেও ।

এখন কি উপায় ! সকলের দৃষ্টি নিবদ্ধ হলো ছাত্র তাজুল ইসলাম বাঙ্গীর উপর। "মিয়া কিছু একটা করো!" তিনি বললেন যে, হুজুর আমাকে ষ্টেজের এক কোনে চাদরাবৃত্ত করে দিন। আর ওদেরকে ঐ কবিতা গেয়ে শেষ করতে দিন। তাই করা হলো। শেষ হওয়ার পর তিনি চাদরাবৃত্ত হতে উঠে মাইক হাতে নিয়ে বলতে লাগলেন যে, তোমাদের নবীযে মিথ্যা ও ভন্ড এর প্রমান অসংখ্যা ভূলে ভরা এই কবিতার পন্ডুলিপি। এতনং পৃষ্ঠা উল্টাও! এর অমুক পংকিতে ব্যাকরণগত ভূল রয়েছে। এর সঠিক বাক্যটা এভাবে হবে। এভাবে শত শত ভূল ধরিয়ে দিয়ে পাল্টা চেল্যাঞ্জ ছুড়ে দিয়ে বললেন যে, কবিতা রচনা করলেই যদি নবী হওয়া যায়, তাহলে এই শুন আমি খতমে নবুওয়্যতের উপর স্বরচিত আরবী কবিতা আবৃতি করছি। পার যদি ভূল ধর। না হয় আমাদের নবীকে মান। ভণ্ড মূর্খ গোলাম আহমদকে নবী মানছ কেন? তার আবৃতি শেষ হওয়ার আগেই ভণ্ডরা পালিয়ে গেল। কাফেররা পরাজিত হলো। তাজুল ইসলাম বাঙ্গালীর হাতে ইসলামের বিজয়ের পতাকা উড়ল। এমন অসংখ্য সফলতা বিজয়ের ইতিহাস রচিত হয়েছে এই কিংবদন্তি মহানায়কের জীবনের পরতে পরতে। বলতে দ্বিধা নেই যে, তাঁর সময়ের তিনিই শ্রেষ্ঠ, অদ্বিতীয় তর্ক যুদ্ধা, বিশ্ব নন্দিত আলেম ছিলেন। হক্বের মূর্ত প্রতিক, সিংহপুরুষ ও বাতিলের আতংক ছিলেন। তাঁর তিরোধানের পর থেকে অদ্যবধি তাঁর শুন্যস্থান পূরণ করার মত সুযোগ্য উত্তরসুরী তৈরি হয়ে আসেনি। এর চেয়ে দুঃখজনক যে এ প্রজন্মের ছাত্র আলেমদের অনেকে তার নামও শুনে নাই কখনো। হায়রে আপসোস (!)

সিংহের অনুপস্থিতিতে তার ছোট্ট সাবকদের পেয়ে যেমন শিয়ালের পাল এদের লেজ কামড়ে ধরে, খেলে, মজা করে। ফখরে বাঙ্গালের মত সিংহ পুরুষদের অনুপস্থিতিতে আজ চতুরমুখি নানান ফ্যারকাবাজ ফিৎনাবাজরাও আমাদেরকে নিয়ে খেলছে মজা ও তামাশা করছে।

তাই বন্ধুরা আসুন, নিজেদের আকাবির, পূর্বসুরীদেরকে ভালভাবে চিনি ও জানি। বাতিল প্রতিরোধে তাদের ভূমিকা, কৌশল সম্পর্কে অবহিত হই। বাচঁতে হলে সেগুলো প্রয়োগ করা যে আজ বড্ড প্রয়োজন। তা না হলে ঐ শিয়ালের দল আমাদের লেজ শুধু নয় কলজে শুদ্ধ চিবিয়ে খাবে।

পরিশেষে দ্বিতীয় মুদ্রণে উন্নত কাগজ, বাইন্ডিং, প্রচ্ছদ, ছাপা ও প্রয়োজন মোতাবেক সংশোধন সংস্কার করতে কারপন্য করা হয়নি। আশা করি সকলের সুখ পাঠ্য হবে। তার পরও কোন ভূল ধরা পরলে দয়া করে জানালে কৃতজ্ঞ হব এবং পরবর্তি সংস্করণে সংশোধনের যথা সাধ্য চেষ্ঠা করব।

মহান প্রভুরতরে বিনীত প্রার্থনা করছি যেন তার অসীম দয়া, করুনা অনুকম্পায় এই নরাধমকে ক্ষমা করেন। এবং প্রিয় হাবীবের শানে বইটি অনুবাদ ও প্রকাশের অসিলায় এই গোনাহগার সহ সংশ্লিষ্ঠ সকলকে কিয়ামতের কঠিন দিনে কাওসার পান ও শাফায়েত নসীব করে জান্নাতে তার সাথে সহাবস্থানের পরম সৌভাগ্য দানে ধন্য করুন। আমিন।

দোয়ার মোহতাজ
মোস্তাফিজুর রহমান।
২৮/১১/১০ ইং
ফখরে বাঙ্গাল পাবলিকেশন্স ঢাকা
১৮৪, তেজগাঁও শিল্প এলাকা, ঢাকা-১২০৮

†jL‡Ki K_v

একজন মুসলমানের জন্য এর চেয়ে সৌভাগ্যের বিষয় আর কী হতে পারে যে, তাঁর জবানকে সর্বদা প্রিয় নবীজির (সা.) আলোচনায় সতেজ রাখবে। স্বীয় চিন্তা-চেতনায় কেবল দয়াল নবীজির আদর্শ-কর্ম, আখলাক-চরিত্র বিদ্যমান রাখবে। তাঁর ধ্যান-খেয়ালে কেবল প্রিয় নবীজির (সা.) অনুপম রূপমাধুরী, নির্মল প্রকৃতির প্রতিচ্ছবি সদা ভেসে বেড়াবে। প্রতিটি মুসলমানের জন্য তার নিজেকে জানা যতটুকু জরুরী, তার চেয়ে অনেক অনেক গুন বেশী জরুরী প্রিয় নবীজিকে জানা। কেননা, প্রিয় নবী (সা.) সম্পর্কে যথাযথভাবে জানতে না পারলে তাঁর প্রতি ভালবাসা ও পূর্ণতা লাভ করতে পারবে না। আর তাঁকে পরিপূর্ণ ভালবাসতে না পারলে খাঁটি মুমিনও হওয়া যাবে না। তাঁকে ভালবাসতে হলে তাঁকে নিখুঁতভাবে জানার বিকল্প নেই। তাঁর জীবনাদর্শই হল ইসলাম নামক জীবনব্যবস্থার বাস্তব নমুনা। সুতরাং ইসলামের পূর্ণ অনুসারী হতে হলে, আল্লাহর সান্নিধ্য লাভ করতে হলে রাসূলের ভালবাসার পূর্ণ স্বাদ লাভ করতে হলে সর্বাগ্রে জানতে হবে প্রিয় নবীজি পবিত্র দৈহিক গড়নের পরিপূর্ণ বিবরণ। তাঁর আখলাক-চরিত্র, চলাফেরা, পোশাক-পরিচ্ছদ, পছন্দ-অপছন্দের যাবতীয় বিষয়াবলী। বক্ষমান পুস্তকে এই বিষয়গুলি অত্যন্ত নির্ভরযোগ্য ও বিশুদ্ধ হাদীস ও দলীল-এর মাধ্যমে সংক্ষিপ্ত আকারে তুলে ধরা হয়েছে। যাতে প্রতিটি মুসলমান খুব সহজেই প্রিয় নবীজি (সা.)কে জানতে পারে। হৃদয়ের আয়নায় অংকিত করে নিতে পারে দয়াল নবীজির (সা.) বাস্তব চিত্র। বিশেষত: যে সকল নবী প্রেমিক রাসূল (সা.)কে স্বচোখে দেখতে না পারায় আক্ষেপ করে থাকেন, তাদের জন্য এই বই অনেকটা মনের খোরাক জোগাবে। মোটকথা, এই বই প্রতিটি মুমিনের ঈমানকে শানিত করবে। নবী প্রেমিকের হৃদয়-মনে ভালবাসার ঝড় তুলতে সক্ষম হবে। নবী প্রেমের প্রকৃত স্বাদ তারা অনুভব করে ধন্য হবে। আর সেই ভালবাসার টানে যদি প্রতিটি মুমিন রাসূলের (সা.) প্রত্যেকটি সুন্নতের পাবন্দ হয়ে ওঠে। আখলাকে হাসানা ও খুলুমে আযীম-এর রঙ্গে স্বীয় জীবনকে রাঙ্গাতে পারে, তবেই অধমের এই ক্ষুদ্র প্রচেষ্টা, শ্রম-সাধনা স্বার্থক ও সফল হবে।

সুপ্রিয় পাঠক মহোদয়ের নিকট নিজের সকল অক্ষমতা, দূর্বলতা স্বীকার করার পাশাপাশি এ কথাও আরজ করতে চাই যে, আমি বড় কোন পণ্ডিত বা সাহিত্যিক নই, তাই ভুল-ত্রুটি থেকে যাওয়াটা স্বাভাবিক। কাজেই কোন ভুল-ত্রুটি কারো দৃষ্টিগোচর হলে অধমকে অবহিত করবেন, চির কৃতজ্ঞ হব।

পরিশেষে পরম করুনাময়ের নিকট প্রার্থনা, তিনি তাঁর নিজ দয়ায় অধমের এই ক্ষুদ্র প্রচেষ্টা কবুল করে নিন এবং এর অছিলায় অধমকে রোজ হাশরে তাঁর হাবীবের হাতে কাউসারের পানি পান করার তওফীক দিন। তাঁর শাফায়াত নসীব করুন এবং জান্নাতে তাঁর সাথে অবস্থান করার সৌভাগ্য দান করুন। আমীন। ছুম্মা আমী।

আরজ গুজার
বান্দা মোঃ সুলাইমান কাসেমী
খুশহালপুরী। সাহারানপুর
ইউ.পি ভারত

Abev`‡Ki AviR

webqi mv‡_ ü`‡qi wKQ K_v

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম
ওয়া আহসানু মিনকা লাম তারা ক্বাত্তু আইনি * ওয়া আজমালু মিনকা লাম তালিদিন নিসাউ
খুলিকতা মুবাররাআ মিন কুল্লি আইবিন * কা আন্নাকা খুলিকতা কামা তাশাউ

তব হতে অধিক সুন্দর এই দু'নয়ন কভু দেখেনি
তব হতে অধিক পুণ্যময় সুসন্তান জন্মায়নি আদৌ কোন জননী
সর্বপ্রকার ত্রুটিমুক্ত হয়ে জন্মিলে তুমি
যেভাবে চেয়েছিলে, ঠিক সেভাবেই যেন জন্মিলে তুমি।

কৃতজ্ঞতা আদায় করে শেষ করা যাবে না; বিশ্ব সভার সভাপতি, নবীগণের সরদান দু'জাহানের বাদশাহ মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মত আপাদ মস্তক পূর্ণ দেহের বিবরণ সম্বলিত একটি জীবনীগ্রন্থ বাংলাভাষায় এ অভাজন অনুবাদ করতে পারবে; এটা অভাবনীয়। অনুবাদ ও প্রকাশের ও তাওফীকের জন্য সর্বপ্রথম আমি মহান সৃষ্টিকর্তা পরম দয়াময় আল্লাহর দরবারে সিজদায়ে শোকর আদায় করছি। শেষ করা যাবে না তথাপি আজীবন কৃতজ্ঞতা আদায় করে যেতে হবে– এটি এমনই এক নেয়ামত।

পৃথিবী নামক এই সুন্দর কানন, যাঁর শুভাগমনকে কেন্দ্র করে সাজানো হয়েছে, যে প্রভাময় প্রোজ্জ্বল দেহের প্রতিচ্ছবির কল্পনা ও আলোচনা প্রতিটি মুমিনের ঈমানকে সতেজ করে। ঈমান বৃদ্ধি করে। যাঁর প্রতি ভক্তি-আসক্তি, হৃদয়ের অকৃত্রিম ভালবাসা প্রতিটি মুমিনের জন্য জান্নাতের পরম পাথেয়, মহান প্রভুর সান্নিধ্য লাভের একমাত্র সোপান।

সেই বিশ্বনবী মোস্তফা (সা.)-এর দৈহিক সৌন্দর্যের নিখুঁত বিবরণ, তাঁর চরিত্র মাধুরীর বাস্তব চিত্র, তাঁর চলাফেরা, কর্ম-আদর্শ, হাসি-আনন্দ, দুঃখ-যাতনা, তাঁর পানাহার, পোশাক-পরিচ্ছদ, তাঁর পছন্দ-অপছন্দের বিষয়, স্বজন ও পরিজনদের সাথে তাঁর মধুর ব্যবহার, মোটকথা, নবী চরিতের যাবতীয় খুঁটিনাটি বিষয়ের উপর এক অনবদ্য রচনা "খাসায়েলে মোস্তফা সা."

ভারতের বিজ্ঞ আলেম মুফতী সুলাইমান কাসেমী সাহারানপুরী রচিত বক্ষমান পুস্তকে লেখক তাঁর সুনিপুন দক্ষতায় একেবারে ছবির মত করে প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে উপস্থাপন করতে চেষ্টা করেছেন। যা মূলত: প্রতিটি নবী প্রেমিকের প্রাণের খোরাক যোগাতে সক্ষম। প্রতিটি বিবরণ শেষে কবি মুযতার-এর কবিতাগুলিকে

সংশ্লিষ্ট আলোচনার সাথে মিল রেখে উপস্থাপন করেছেন, যা 'সোনায় সোহাগা' হয়েছে। ফলে সীরাতের উপর রচিত অন্যান্য বইয়ের তুলানায় একটি ভিন্নতা সৃষ্টি হয়েছে। বইটি বাংলা ভাষায় রূপান্তরিত করার জন্য বিভিন্ন মহল থেকে অনুরোধ আসতে থাকে। পরিশেষে মহান আল্লাহর উপর ভরসা করে বিশিষ্ট উলমায়ে কেরামের পরামর্শক্রমে অনুবাদের কাজে হাত দিই। সত্যি বলতে কি অনুবাদ কর্ম একটি দুরহ ব্যাপার। তবুও বইয়ের মূল ভাবের সাথে মিল রেখে সরল ভাষায় পাঠকের বোঝার উপযোগী করে অনুবাদ করার চেষ্টা করা হয়েছে। বিশেষ করে উর্দু কবিতাগুলি ছন্দাকারে রূপান্তরের চেষ্টা করেছি। ভাষা ও বর্ণনায় লালিত্য এবং মসৃনতা আরোপে আমরা খুব স্বাধীন ছিলাম না। কারণ এটি একটি অনুবাদ গ্রন্থ। লেখকের উর্দু ভাবার্থের সাথে মিল রেখে প্রতিটি কথাই খুব ভেবে-চিন্তে উপস্থাপন করা হয়েছে। সাহিত্যের অবাধ সন্তরণ এখানে অচল। সুতরাং ভাষা সাহিত্যের দৃষ্টিকোণ থেকে নয়, বিষয়, ভাব ও প্রিয় নবীজির (সা.) ভালবাসার আলোকে বইটির বিশ্লেষণ করাই হবে যথার্থ।

একেকটি অংশ অনুবাদের পর মান্যবর সম্পাদক আলহাজ্ব মুফতী আবদুল মতীন সাহেবসহ বিখ্যাত উলামগণের দ্বারা সেটি নিরিক্ষণ করেয়েছি। উপরন্তু পূর্ণ বইটিই এমন বিজ্ঞজনদের দেখিয়েছি, যাঁদের বহু গ্রন্থ বাজারে প্রকাশিত। তাঁদের পরামর্শে প্রয়োজন মোতাবেক সংযোজন বিয়োজন করেছি। এর মধ্যে অনেকে এই অভিমতও ব্যক্ত করেছেন যে, বইটি দ্বারা শুধু সাধারণ পাঠক নন, আলেম সমাজও উপকৃত হবেন, যা প্রথম অনুবাদ হিসেবে আমাকে স্বস্তিদানে যথেষ্ঠ।

ভুল-ত্রুটি মানুষের সহজাত বিষয়। বইটি পাঠান্তে এরূপ কিছু দৃষ্টিগোচর হলে দয়া করে অবহিত করার জন্য বিনীত অনুরোধ করছি এবং এ বিষয়ে সকলের সহযোগিতা কামনা করছি।

পরিশেষ এ মহতি উদ্যোগের সাথে সংশ্লিষ্ট মান্যবর সম্পাদকসহ সকলের প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। অন্তর থেকে দোআ করছি–যারা উৎসাহ-পরামর্শ ও সময়-শ্রম দিয়ে আমাকে সর্বোতভাবে সাহায্য করেছেন, তাদের জন্য। আল্লাহ তা'আলা সকলকে উত্তম বিনিময় দানে ধন্য করুন। আমাকে, আমার জান্নাতবাসী আব্বা-আম্মা, শ্রদ্ধেয় বড় ভাইসহ পরিবারের সবাইকে উভয় জাহানে কামিয়াবী দান করুন। আমীন।

বিনীত

মোস্তাফিজুর রহমান।

বাবলী জামে মসজিদ, ১৮৪,তেজগাও শি/এ, ঢাকা

mPxcÎ

welq côv

welq	côv

প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দৈহিক গঠন ঃ

বিশ্বনবী মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র সৌন্দর্যের যথাযথ বিবরণ দেয়া অসম্ভব। প্রভাময় দেহের সঠিক চিত্র অংকন করা মানবের সাধ্যের বাইরে। তাইতো ইমাম কুরতুবী (রহঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যদি স্বরূপে আমাদের মাঝে আবির্ভূত হতেন, তাহলে তাঁকে অবলোকন করা কারুর পক্ষেই সম্ভব হত না। যাহোক এই উম্মতের উপর সাহাবায়ে কেরামের এক বিরাট অনুগ্রহ যে, তাঁরা প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আক্ষরিক ও আধ্যাত্মিক জ্ঞানের পাশাপাশি দৈহিক সৌন্দর্যের বর্ণনাও যথাযথভাবে উম্মতের কাছে পৌঁছে দিয়েছেন। পরম করুণাময় এই মহামনীষীগণকে উত্তম বিনিময় দানে ধন্য করুন। আমীন।

বিখ্যাত কবি জনাব মুয়্তার হনসূরীর কয়েকটি কবিতা উল্লেখ করে মূল আলোচনা শুরু করব।

جمال و حسن کی الفاظ میں تعبیر ناممکن ☆ مجسم نور کی کھینچے کوئی تصویر ناممکن

যেই অনুপম রূপ মাধুরী, যায় না বলা বর্ণমালায়,
যেই নূরানী দেহের ছবি যায় না আঁকা তুলির ছোঁয়ায়।

جہاں روح الامین ہوں پرسمیٹے ششدر و حیران ☆ وہاں جرات کرے کیا ایک بے مہایہ حقیر انسان

যে রূপ দেখে জিব্রাইলও অবাক হয়ে পিছু হটে যায়,
সেই দুঃসাহস কিভাবে করে ক্ষুদ্র মানুষ যে অসহায়।

کوئی لغزش نہ ہو جائے الہی اس سے ڈرتا ہوں ☆ بھروسہ پر تیرے اس کام کا آغاز کرتا ہوں

খুব ভয়, ওগো দয়াময়! না জানি কোন ভুল ফের হয়ে যায়,
তোমার উপর ভরসা করেই এ কাজ শুরু করতে চাই।

প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দেহের উচ্চতা ঃ

হযরত আলী (রাযি.) ও হযরত আনাস ইবনে মালেক (রাযি.) রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র দেহাবয়বের বর্ণনা দিতে গিয়ে বলেন, রাসূল

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অধিক লম্বাও ছিলেন না, আবার অতি বেটেও ছিলেন না । তবে মাঝারি গড়নের লোকদের মত ছিলেন ।
(বুখারী শরীফ ১ম খণ্ড, ৫০২ পৃষ্ঠা)
যাদুল মা'আদ ৫৪ পৃষ্ঠায় রয়েছে, হিজরত করার সময় হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উম্মে মা'বাদ খাজাঈয়া (রাযি.)-এর তাবুর নিকট দিয়ে অতিক্রম করছিলেন । নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম চলে যাওয়ার পর তিনি তাঁর স্বামীর নিকট নবীজির দেহাবয়বের যে চিত্র অংকন করেছিলেন, তাতে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উচ্চতার ব্যাপারে বলেছিলেন, তিনি ছিলেন মাঝারি গড়নের । এত বেঁটে ছিলেন না যে, গণনার বাইরে । আবার এত লম্বাও ছিলেন না যে, দৃষ্টিকটু । যেন দু'টি ডালার মধ্যে তৃতীয় একটি ডালা, যা তিনটি ডালার মধ্যে সবচেয়ে বেশী চমৎকার ও দৃষ্টিনন্দন ।
(আর-রাহীকুল মাখতুম-৭৫১ পৃষ্ঠা)
হিন্দ ইবনে আবি হালা, যিনি হযরত খাদীজা (রাযি.)-এর প্রথম স্বামীর সন্তান ছিলেন এবং প্রিয় নবীজির দেহের নান্দনিক উপস্থাপনার ক্ষেত্রে সকল সাহাবা অপেক্ষা দক্ষ ছিলেন । তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দেহ মোবারক মাঝারি গড়নের পাশাপাশি একটু লম্বার দিকে ঝুঁক ছিল ।
(শামায়েলে তিরমিযী-২ পৃষ্ঠা)
রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন কোন সভায় (জনতার ভিড়ে) অবস্থান করতেন, তখন তাঁকে সবার থেকে উঁচু দেখা যেত । এটা ছিল তাঁর মু'জিযা । অর্থাৎ যেমনিভাবে আধ্যাত্মিক গুণাবলীতে তাঁর থেকে উচ্চ মর্যাদাশীল কেউ ছিল না, তেমনিভাবে বাহ্যিক আকৃতিতেও তাঁর সমকক্ষ কেউ ছিল না ।
(খাসায়েলে নববী সা.)
কবি মুযতার-এর ছন্দময় উপস্থাপনা ঃ

نہ پستہ قد نہ لا نبے ہی کوئی مفہوم ہوتے تھے ☆ میانے قد سے کچھ نکلے ہوئے معلوم ہوتے تھے

তিনি খুব বেঁটে ছিলেন না, না অতি দীর্ঘকায় বুঝা যেত,
মাঝারি গড়ন হতে একুট উচ্চতর অনুভব করা যেত ।

مگر مجمعے میں ہوتے تھے جب کبھی حضرت والا ☆ نمایاں اور اونچا ہوتا تھا سرو قد بالا

কিন্তু কোন জনসভায় তিনি হতেন যদি আগত
সবার চেয়ে উন্নত শির, উচ্চতা তাঁর হত উদ্গত ।
প্রিয়নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বর্ণ ঃ
হযরত আলী (রাযি.) হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের গুণাবলী বর্ণনা

করতে গিয়ে বলেন, তিনি সুন্দর গোলাপী বর্ণের ছিলেন। (শামায়েলে তিরিমিযী)
হযরত আনাস (রাযি.) বলেন, তিনি 'আযহারুল লাউন' তথা লালিমা মিশ্রিত শ্বেত বর্ণের অধিকারী ছিলেন। (বুখারী ৫০২/১)
হযরত আবু হুরাইরা (রাযি.) রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের রং মোবারকের বর্ণনায় বলেন, তিনি এত সুন্দর, নান্দনিক এবং পরিস্কার পরিচ্ছন্ন ছিলেন, যেন তাঁর পবিত্র দেহখানা পূর্ণিমার চন্দ্র দ্বারা ধৌত করা হয়েছে।
(শামায়েলে তিরমিযী)
মাদারিজুন নবুওয়াত গ্রন্থে আছে, হযরত আবু হুরাইরা (রাযি.) বলেন, আমি হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে অধিক সুন্দর আর কাউকে দেখেনি। যেন প্রিয়নবীজির পবিত্র (মুখমন্ডল) চেহারায় সূর্য সাতার কাটছে। তিনি যখন মুচকি হাসতেন, তখন দেয়ালে প্রভা চমকাতো। (উসওয়ায়ে রাসূল সা. ৪৮ পৃষ্ঠা)
মোটকথা, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র বর্ণ অত্যন্ত উজ্জ্বল লালিমা মিশ্রিত শুভ্র ছিল। নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের রং মোবারকের বর্ণনা দিতে গিয়ে উম্মে মা'বাদ বলেন, প্রভাযুক্ত রং, দূর থেকে দেখলে সর্বাধিক আলোকিত জ্যোতির্ময়, কাছ থেকে দেখলে অতীব দৃষ্টিনন্দন।
(আর-রাহীকুল মাখতুম ৭৫১)
কবির ভাষায় ঃ

درخشاں حس طرح سیم مصطفٰی کوئی پیکر☆ وہ اک نور مجسم بدر کامل سے بھی روشن تر

جمیل ودلکش ایسے دور سے چوں مہر تابندہ☆ جو ہوں نزدیک تو خوش منظر وشیریں وزیبندہ

نہ رنگت سانولی تھی اور نہ تھے اجلے بھبھوکے سے☆ سفید اور سرخ گورے گندمی تھے اور چمکتے تھے

کبھی جب مسکرا دیتے تو بجلی کوند جاتی تھی☆ دور دیوار پر اک روشنی سی جگمگاتی تھی

দীপ্তময় চেহারা মোস্তফা যেন একটি ছবি,
সে এক নূরানী দেহ, যেন পূর্ণিমা হতেও প্রোজ্জল, নবী।

এত সুন্দর, মনোরম, দূর হতে যেন তেজদীপ্ত সূর্য,
কাছ থেকে তিনি এক অপূর্ব দৃশ্য, মিষ্টি অপরূপ সৌন্দর্য।

বর্ণটা তাঁর ছিল না শ্যামল, ছিল না অগ্নিশিখা প্রজ্জোল,
লালিমা মাখা শুভ্র ছিলেন, সুন্দর বাদামী রঙ্গে ছিলেন উজ্জল।

যখন দিতেন মুচতি হাসি, চমকে যেত বিদ্যুৎ রশ্মি,

দেয়াল দরজায় খেলে যেত, এক পশলা আলোকরশ্মি ।
রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দেহের গঠনপ্রণালী ঃ
উম্মে মা'বাদ (রাযি.) বলেন, চমৎকার গঠন, একেবারে হালকা-পাতলাও ছিল না আর অতি মোটা, মেদযুক্তও ছিল না । সৌন্দর্য যেথায় জ্যোতি ছড়ায় এমন নয়নাভিরাম একটি আকৃতি ।
(আর-রাহীকুল মাখতুম ৭৫১)
হযরত আলী (রাযি.) প্রিয় নবীজির দেহাবয়ব বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন, তিনি খুব মোটা দেহের অধিকারী ছিলেন না । হযরত আবু তুফাইল আমের ইবনে ওয়াছেলা বলেন, তিনি মাঝারি ধরনের দেহের অধিকারী ছিলেন । হিন্দ ইবনে আবি হালা (রাযি.)-এর বর্ণনা হল 'তিনি পরিমার্জিত সু-স্বাস্থ্যের অধিকারী ছিলেন ।' (তিরমিযী, শামায়েলে তিরমিযী)
সারকথা ঃ তিনি এত মোটা ছিলেন না যে, দেখতে খারাপ দেখায় । আবার এত হালকা পাতলাও ছিলেন না যে, দেখতে রুগ্ন দেখায় । মাঝারি ধরনের পরিমার্জিত দেহ, যা শক্তিশালী ও বীরত্বের স্বাক্ষর বহন করে । কবির ভাষায় ঃ
وہ بستان لطافت کا نہال آسماں پایہ☆وہ قدرت کے خزانے کا دریکتاں گرانمایہ
তিনি সৌন্দর্য কাননের এক আকাশচুম্বি চারা,
তিনি কুদরতী ভান্ডারের এক উদগত অমূল্য হিরা ।
প্রিয় নবীজির মাথা মোবারক ঃ
হিন্দ ইবনে আবি হাওলা এবং হযরত আলী (রাযি.)-এর বর্ণনা যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মাথা মোবারক স্বাভাবিক থাকার পাশাপাশি অন্যদের তুলনায় সামান্য বড় ছিল । (শামায়েলে তিরমিযী) অর্থাৎ এত বড় ছিল না যে, দৃষ্টিকটু দেখায়, তবে অন্যদের থেকে তুলনামুলক একটু বড় ছিল, যা বুদ্ধিমত্তা ও বিচক্ষণতার প্রতীক । কবি বলেন ঃ
سر اقدس جو نور عقل کامل سے منور تھا☆کلاں باعتدال اقائے عالی جاہ کا سر تھا
পবিত্র সেই শির, যা ঐশী জ্ঞান ভাণ্ডারে পরিপূর্ণ ছিল,
ত্রুটিমুক্ত, একটু বড়, নবীজির মাথা সুন্দর ছিল ।
প্রিয় নবীজীর চেহারা মোবারক ঃ
হিন্দ ইবনে আবি হালা (রাযি.) বর্ণনা করেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রভাময় চেহারা যারা দেখতে চাইত, তারা নবীজিকে মহান সম্মানিত ও ঐশ্বর্যমন্ডিত দেখতে পেত । তাঁর চেহারা পূর্ণিমার চাঁদের চেয়েও ঔজ্জ্বল্যময়

ছল। (ঔজ্জ্বল্য ছড়ানো)। হযরত আলী (রাযি.)-এর বর্ণনা 'কানা ফিল ওয়াজহে কাদীরুম্মা' তাঁর চেহারা গোল ধরনের ছিল। (শামায়েলে তিরমিযী) অর্থাৎ চেহারা মোবারক একদম লম্বা ছিল না, একেবারে গোলও ছিল না। বরং মধ্যমাকৃতির ছিল। হযরত বারা (রাযি.)কে কেউ জিজ্ঞেস করেছিল, নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চেহারা কি তরবারীর মত শ্বেত বর্ণের ছিল? তিনি উত্তরে বললেন, না, বরং চৌদ্দ তারিখের চাঁদের মত উজ্জ্বল এবং গোলাকৃতির ছিল।
(বুখারী ১ম খণ্ড, ৫০২ পৃষ্ঠা)
যেহেতু তলোয়ারের সাথে তুলনা করার দ্বারা অনেক লম্বা হওয়ার প্রতি সন্দেহ হতে পারে। হয়ত তরবারীর চমকের মধ্যে সাদার ঝলক চমকায়, নূরানী ঝলক থাকে না। এই জন্য বারা (রাযি.) পূর্ণিমার সাথে তুলনা করেছেন। এতে চমক ও উজ্জ্বলতা এবং গোল হওয়া সবই বিদ্যমান। তারপরও এসবতো কেবল বোঝানোর জন্য উদাহরণ মাত্র। বাস্তবতার নিরিখে বলতে গেলে এক চাঁদ কী? আমার নবীজির মত উজ্জ্বলতা হাজার পূর্ণিমাতেও খুঁজে পাওয়া দূরহ, অসম্ভব।
হযরত আয়েশা (রাযি.) যিনি প্রিয় নবীজির সবচেয়ে আদরের স্ত্রী ছিলেন, তাঁর দু'টি কবিতার অর্থ এই ঃ জুলায়খার বান্ধবীরা যদি আমার নবী (সা.)-এর চেহারা মোবারক দেখতে পেত, তাহলে হাতের পরিবর্তে হৃদয়টাই কেটে ফেলত।
অর্থাৎ হযরত ইউসুফ (আ.)কে দেখে তারাতো কেবল হাতের আঙ্গুলই কেটেছিল, যদি তারা আমার প্রিয় নবীকে দেখতে পেত, তাহলে তারা হাতের পরিবর্তে হৃদয়টাই কেটে ফেলত। আমার নবীজীর চেহারা মোবারক এত মায়াবী ও উজ্জ্বল ছিল। এই বিষয়টার বিবরণ কবি মুযতার-এর ভাষায় ঃ

وہ گول اور طول کو تھوڑا سا مائل چہرۂ انور ☆ مہ و خورشید جس کے سامنے شرمندہ و کمتر

গোল ও লম্বার সমন্বয়ে ছিল আমার নবীর চেহারা,
রবি, শশি যার সামনে লজ্জিত ও জ্যোতিহারা।

اچانک دیکھ لیتا جب کوئی مرعوب ہو جاتا ☆ مگر اللہ کا محبوب پھر محبوب ہو جاتا

নবীকে যে দেখতে পেত, ভক্ত সে হয়েই যেত,
মহান আল্লাহর প্রিয় হাবীব তারও তখন প্রিয় হত।

وجاہت اور شوکت بھی جمال دلبرانہ بھی ☆ جلال حسن بھی اور عظمت پیغمبرانہ بھی

ব্যক্তিত্ব ও ঐশ্বর্য ছিল, মন ভোলানো আদর্শ ছিল,
সৌন্দর্যের জ্যোতি ছিল, পয়গম্বরী মহত্ত ছিল।

وہ روئے پاک جیسے تیرتا ہو آفتاب اسمیں ☆ جمال حق ما منظر آئینہ ام الکتاب اسمیں

ঐ পবিত্র চেহারা সূর্য্য হাবুডুবু খেত যাতে,
স্রষ্টার শোভার উদগত দর্পণ এতে, শ্রেষ্ঠ কিতাবের ছবিও তাতে।

نمایاں حسن یوسف میں سفیدی تھی صباحت تھی ☆ یہاں سرخی تھی گل گوں رنگ تھا جسمین ملاحت تھی

ইউসুফের লাবন্যতায় উঠত ভেসে সাদা শোভা,
নবীর চেহারায় লালিমামাখা পুষ্প নিত লাবন্যতা।

زنان مصر کی واں رہ گئی تھیں انگلیاں کٹکر ☆ یہاں قربان کر ڈالے ہیں مرداں عرب نے سر

আঙ্গুল কেটে আলোচিত হল মিশরের ঐ ললনারা
নবীর প্রেমে কোরবান হল আরবের বীর পুরুষেরা।

প্রিয় নবীজির মুখ মোবারক ঃ

হযরত জাবের ইবনে সামুরা (রাযি.) নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দেহাবয়ব বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন, তাঁর মুখ মোবারক খোলা ও প্রশস্ত ছিল। খুব সংকীর্ণ ছিল না। আরবরা সংকীর্ণ মুখ ভালবাসত না। প্রশস্ত ও খোলা মুখকে প্রশংসিত মনে করা হত। প্রশস্ত মুখ স্পষ্টভাষীর নিদর্শন ছিল। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মুখ মোবারকও ছিল স্বাভাবিক প্রশস্ত।

প্রিয় নবীজির (সা.) দাঁত মোবারক ঃ

হযরত হিন্দ ইবনে আবি হালা (রাযি.) বলেন, তিনি মুফাল্লিজুল আস্‌নান অর্থাৎ দন্ত মোবারক চিকন ছিল এবং এর মধ্যে সামনের দাঁতগুলোর মাঝে একটু ফাঁক ছিল। শুভ্রতার ব্যাপারে অন্যস্থানে বলেন, মুচকি হাসির সময় তাঁর দাঁত মোবারক শিলাখন্ডের ন্যায় সাদা চকচক করে উঠত।

হযরত ইবনে আব্বাস (রাযি.) বলেন, তাঁর সম্মুখের দাঁতগুলি পৃথক পৃথক ছিল। অর্থাৎ মাঝে ফাঁক ছিল, ঘন ছিল না। যখন তিনি কথা বলতেন, তখন এই দাঁত মোবারক হতে যেন নূর ঠিকরে পড়ত। (মেশকাত শরীফ ২য় খন্ড, ৫৭১ পৃষ্ঠা)

حیاء سے سر جھکا دینا ادا سے مسکرا دینا ☆ حسینوں کو بھی کتنا سہل ہے بجلی گرا دینا

লজ্জায় মাথা নুইয়ে দেয়া, লাবন্যতায় মুচকি হাসা,
সুন্দর যারা পারে তারা হাসি দিলে বিদ্যুৎ আসা।

'খাসায়েলে নববী' নামক গ্রন্থে আল্লামা মুনাবী (রহঃ)-এর বাণী বর্ণনা করা হয়েছে যে, এটা একটা ঐচ্ছিক ব্যাপার ছিল, যা মু'জিযা হিসেবে প্রিয় নবীজি (সা.)-এর দন্ত মোবারকের মাধ্যমে প্রকাশ পেত। মোটকথা, নবীজির দেহ মোবারকের

প্রতিটি অঙ্গ সৌন্দর্যতায় পূর্ণ ছিল।

মুখের ভিতর ছিল খোলামেলা। সুবিন্যস্ত ছিল দাঁতগুলো,
অধিক সুন্দর্য ও মসৃনতায়, যা মুক্তার মালা হতেও চমকাতো।

এ যেন এক জ্যোতির দানি, জ্যোতি ঢেলে রাখা হয় যার মাঝে
কথা বলার সময় একটু একটু করে আলো ছড়ায় সবার মাঝে।
প্রিয় নবীজি (সা.)-এর ললাট মোবারক ঃ
রাসূল (সা.)-এর ললাট মোবারক দু'টি গুণের সমাহার ছিল। প্রথমত: সামনের দিকে বাড়তি ছিল না। যেটা হযরত আলী (রাযি.)-এর বর্ণনা যে, নবী (সা.) নিচু ললাট বিশিষ্ট ছিলেন।
(আর-রাহীকুল মাখতুম-৭৫২ পৃষ্ঠা)
হিন্দ বিন আবি হালা বর্ণনা করেন, তিনি প্রশস্ত ললাটের অধিকারী ছিলেন। অর্থাৎ তাঁর ললাট মোবারক অন্যদের তুলনায় একটু প্রশস্ত ছিল, যা বিচক্ষণতার পরিচায়ক। (খাসায়েলে নববী) কবি মুযতার-এর ভাষ্য মতে ঃ
کشادہ اورنورانی مبارک پاک پیشانی ☆ کہ جس سے عاریت شمس وقمر نے لی ہے تابانی
প্রশস্ত ও আলোকিত পবিত্র তাঁর ললাটখানি,
রবি শশি তাঁর থেকে যেন ধার নিয়েছে তাপখানি।
প্রিয় নবীজির নাসিকা মোবারক ঃ
হিন্দ বিন আবি হালা (রাযি.) বর্ণনা করেন, তাঁর নাক মোবারক চেপটা ও ছড়ানো ছিল না, বরং উচ্চ প্রকৃতির ছিল। উপরের দিকে উন্নত ছিল এবং এর উপর প্রভা চমকাতো। কেউ প্রথমে দেখলে তাঁকে উন্নত নাসিকার অধিকারী ধারণা করত। কিন্তু নিবিড়ভাবে নিরিক্ষণ করলে বুঝতে পারত যে, তা লাবণ্যতা ও উজ্জ্বলতার কারণে উঁচু মনে হত। মূলত: তা অধিক লম্বা ছিল না। (শামায়েলে তিরমিযী)
চেপটা ও মোটা নাক চেহারার সৌন্দর্যতা বিনষ্ট করে দেয়। আর যে নাক অধিক প্রসারিত না হয়ে উপরের দিকে ঈষৎ উন্নত হয়ে থাকে, সেটা চেহারার সৌন্দর্য আরো বৃদ্ধি করে। কবি মুযতার-এর ভাষায় ঃ
وہ بینی مبارک جس پرنوراک جگمگاتا تھا ☆ کہ جوظاہر میں بینی کی بلندی کو بڑھاتا تھا
ঐ নাসিকা মোবারক, যার উপর একটু আলোকিত ছিল,

আসলে তা নাসিকার উচ্চতাকে বাড়াচ্ছিল ।

প্রিয় নবীজির (সা.)-এর চোখ মোবারক ঃ

নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নয়নযুগল স্বভাবজাতভাবেই সুরমামাখা ছিল । হযরত জাবের (রাযি.) বলেন, আমি যখন হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে সাক্ষাত করতাম, তখন মনে মনে ভাবতাম, তিনি এইমাত্র চোখে সুরমা লাগিয়েছেন । অথচ তিনি তখন সুরমা লাগাননি ।

হযরত আলী (রাযি.) প্রিয় নবী (সা.)-এর দেহাবয়ব-এর বর্ণনা দিতে বলেন, তাঁর নয়নের পুতলি দুটো অত্যন্ত কালো ছিল । হযরত উম্মে মা'বাদ খাযাঈ (রাযি.) বলেন, সাদা ও কালো সুরমা মাখা আঁখি ছিল । (আর-রাহীকুল মাখতুম ৭৫১ পৃষ্ঠা)

অর্থাৎ পুতুলিটা খুব কালো এবং এর পার্শ্বের অংশটা সাদা ছিল । কিন্তু এই সাদা অংশে লাল দাগ পড়েছিল ।

হযরত আলী (রাযি.) বর্ণনা করেন, তাঁর আঁখিযুগল লালিমা মিশ্রিত ছিল ।

হযরত জাবের ইবনে সামুরা (রাযি.) বলেন, নবী আকরাম (সা.)-এর নয়নযুগল 'আসকালুল আইনাইন' ছিল । যার সঠিক অর্থঃ তাঁর চক্ষুদ্বয়ের শুভ্রতায় লাল দাগ পড়েছিল । আঁখিযুগল একটু বড় হওয়া, এর সাদার মধ্যে লালিমা মিলিত হওয়া এরপর পুতুলিদ্বয় খুব কালো হওয়া এসবই চোখের সৌন্দর্যতার প্রতীক । তারপর আবার তিনি কাউকে পূর্ণ চোখে না দেখে চোখের কোন্ দ্বারা দেখতেন । যা লাজুকতার বর্ণনায় এসেছে । কবির ভাষায় ঃ

خمار آلودہ آنکھوں پر ہزاروں میکدے قربان ☆ وہ قاتل بے پیئے ہی رات دن مخمور رہتا ہے

পাগলকরা আঁখি দেখে অজস্র প্রেমিক হয় কোরবান,
তিনি এমন প্রাণ সংহারি তবুও তারা হয় আগোয়ান ।

چمکدار اور سیہ پتلی بڑی آنکھیں حسین آنکھیں ☆ کہ بے سرمہ بھی رہتی تھیں ہمیشہ سرمگیں آنکھیں

উজ্জ্বল কালো পুতুলিযুক্ত ডাগর সুন্দর দারুন আঁখি,
সুরমা ছাড়াই মনে হত সুরমামাখা সদা আঁখি ।

ذرا آنکھوں میں سرخی ارغوانی رنگ ہلکا سا ☆ بہشتی ساغروں پر کوثر گل رنگ چھلکا سا

নয়নযুগলে একটু লালাভ, রক্তিম আভা একটুখানি,
জান্নাতী সাগরসমূহকে কাউসারের যেন রং ছিঁটানি ।

سفیدی میں تھے ڈورے سرخ جن پر ہوں فدا جانیں ☆ گھنیر لمبی لمبی اور کالی کالی مژگانیں

সাদার মাঝে রাঙ্গা ডোরা, যার উপরে মুগ্ধ সবাই,

প্রিয় নবীজির (সা.) পলক মোবারক ঃ
হযরত আলী (রাযি.) বর্ণনা করেন, তিনি 'আহদাবুল আশরাফ' অর্থাৎ তিনি লম্বা লম্বা পলকবিশিষ্ট ছিলেন। (শামায়েলে তিরমিযী)
তদ্রুপ পলক লম্বা হওয়ার সাথে সাথে ঘন ও ঠাসা ছিল। এই জন্যই তাঁকে দেখলে মনে হত যেন সুরমামাখা আঁখি, যা হযরত জাবের (রাযি.)-এর বর্ণনায় উল্লেখ করা হয়েছে। এমনিভাবে হযরত উম্মে মা'বাদ খাযাঈয়া বলেন, তাঁর লম্বা এবং কালো সুরমা মিশ্রিত পলক ছিল। (আর-রাহীকুল মাখতুম ৭৫১ পৃষ্ঠা)
প্রিয় নবীজির (সা.) পবিত্র মুখমন্ডল ঃ
হযরত হিন্দ বিন আবি হালা (রাযি.) রাসূলে পাক (সা.)-এর দেহাবয়ব-এর বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন, প্রিয় নবীজির (সা.) মুখমন্ডল অত্যন্ত মুলায়েম ও হালকা গোশত লটকানো ছিল বলে মনে হত। (শামায়েলে তিরমিযী, খাসায়েল)
হযরত আলী (রাযি.) বর্ণনা করেন, প্রিয় নবী (সা.)-এর মুখমন্ডলে (গালে) খুব বেশি গোশত ছিল না। আবার চিবুক খুব ছোটও ছিল না, বরং স্বাভাবিকভাবে (চেহারা) মুখমন্ডল ও চিবুক বরাবর ছিল। মোটকথা, চেহারা মোবারকে বিন্দুমাত্র ত্রুটির লক্ষণ ছিল না, যা দেখতে অসুন্দর দেখায়। এ সম্পর্কে কবি মুযতার-এর অপূর্ব উপস্থাপনা ঃ

تھے رخسار مبارک آپ کے ہموار اور ہلکے ☆ وہ گویا تھے کھلے اوراق قرآن مکمل کے

হালকা মোলায়েম, সমতল ছিল আমার নবীর চাঁদমুখ খানি,
কুরআনে পাকের পাতা যেন চেহারায় ভাসে পুরা নূরানী।
প্রিয় নবীজির (সা.) দাড়ী ও গোঁফ মোবারক ঃ
রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর দাড়ী মোবারক খুব ঘন ছিল। শামায়েলে তিরমিযীতে রয়েছে, তাঁর দাড়ী এত ঘন ছিল যে, পবিত্র বক্ষ ঢেকে যেত। (উসওয়ায়ে রাসূল, শা. তি.)
এমনিভাবে ইমাম কাজী ইয়াজ (রহঃ) কর্তৃক রচিত আশশিফা গ্রন্থে রয়েছে, মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর দাড়ি মোবারক এত প্রচুর ছিল যে, সীনা মোবারক ভরে যেত। (উসওয়ায়ে রাসূল)।
হিন্দ ইবনে আবি হালা (রাযি.) বলেন, তাঁর অর্থাৎ রাসূল (সা.)-এর দাড়ী মোবারক ভরপুর এবং ঠাসা ছিল। (শা. তি.)
রাসূল (সা.)-এর দাড়ী মোবারক কখনো ছাটতেন না। কর্তন করতেন না। হ্যাঁ, কখনো যে চুল অতিরিক্ত হয়ে যেত, সেগুলি কর্তন করতেন, যাতে চেহারা মোবারাক দেখতে অসুন্দর না দেখায়। (সীরাতে মুস্তফা ৫৩৪ পৃষ্ঠা)

গাঁফ মোবারক ঃ

রাসূলুল্লাহ (সা.) গোঁফ মোবারক কেটে খুব ছোট করে রাখতেন । রাসূল (সা.)-এর যুগে অগ্নিপুজকেরা গোঁফ লম্বা করে রাখত । আর দাড়ী খাটো করে রাখত । অথচ এটা ফিতরাত তথা নবীগণের অভ্যাস ও স্বভাব পরীপন্থী ছিল । এ জন্যই নবী (সা.) অগ্নিপুজকদের বিপরীত করার হুকুম দিলেন । সহীহ বুখারী শরীফে হযরত আবু হুরাইরা (রাযি.) হতে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন, দাড়ী বড় কর এবং গোঁফ খাটো কর এবং অগ্নিপুজকদের বিপরীত কর । দাড়ী রাখা শুধু মুহাম্মদ (সা.)–এর আদর্শ ও ইসলামী বিধানই নয়, বরং সমস্ত নবীগণের সুন্নত । যাঁদের সংখ্যা প্রায় এক লক্ষ চব্বিশ হাজার । তাই এই দাড়ী রাখাকে 'মিন সুনানিল মুরসালীন' তথা সকল নবীগণের আদর্শ বা সুন্নত বলা হয় । এমনিভাবে দাড়ী এটা ইসলামের প্রতীক । এ জন্য দাড়ী কাটা ইসলামী বিধানকে প্রকাশ্যে অবমাননা করার শামিল এবং মহাপাপ । (কবিরা গোনাহ) এমনকি দাড়ীকে কটাক্ষ করা, ব্যঙ্গ-বিদ্রুপ বা উপহাস করা কুফরী । কারণ এটা শুধু দাড়ীকেই খাটো করা হল না, বরং সকল নবীগণকে এবং তাঁদের উম্মতের আলেমগণকে উপহাস করা হল । আল্লাহ তা'আলা মুসলমানদেরকে হেদায়েত দান করুন । অধিকাংশ লোক এই জঘন্য অপরাধে লিপ্ত ।১ ইমামগণের নিকট দাড়ীর পরিমাণ এক মুষ্ঠি, এর কম না হওয়া চাই । কবি মুযতার বলেন ঃ

گھنی ریش مبارک تھی کہ بھر دیتی تھی سینے کو☆نظارے کو مسیح و خضر نے مانگا تھا جینے کو

ঘন দাড়ী বক্ষটাকে ভরে দিত প্রিয় নবীজির
এমন সুন্দর দৃশ্যটাযে চেয়েছিল ঈসা ও খিযির ।

প্রিয় নবীজির (সা.) ভ্রূ মোবারক ঃ

হযরত হিন্দ বিন আবি হালা (রাযি.) নবী (সা.)-এর ভ্রূ মোবারকের অবস্থা বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন, তাঁর ভ্রূ মোবারক সূক্ষ্ম, মিহি ও ঘন ছিল । এবং উভয় ভ্রূ পৃথক পৃথক ছিল । একটা অন্যটার সাথে মিলিত ছিল না এবং উভয় ভ্রূর মাঝখানে একটি রগ ছিল, যা রাগান্বিত হওয়ার সময় ভেসে উঠত । অর্থাৎ মোটা হয়ে উঠত । (শা. তি.) ভ্রূ মোবারক তরবারীর ন্যায় বক্র ও মিহি হওয়ায় সৌন্দর্যটাকে আরো বিকশিত করে তুলত । তবে এটা আল্লাহ প্রদত্ত বিষয় । যদি জন্মগতভাবেই এমনটা হয়ে থাকে, তবে তা আলহামদুলিল্লাহি আলা যালিকা । কিন্তু আধুনিক ফ্যাশন হিসেবে (পার্লারে গিয়ে) নিজেরাই এমনটি করতে গেলে তখনতো এটা আল্লাহর সৃষ্টির উপর

হস্তক্ষেপের শামিল, যা শয়তানের ধোঁকা (প্রবঞ্চনা) । যার আলোচনা শয়তানের নিজের উদ্বিতিতেই পবিত্র কুরআনে বর্ণিত হয়েছে ঃ ولامرنهم فليغيرن خلق الله
অর্থ ঃ (শয়তান বলে) আমি তাদেরকে (মানুষকে) আল্লাহর সৃষ্টিটা পরিবর্তন করে ফেলার নির্দেশ দেব । (তরজমায়ে শায়খুল হিন্দ)
খোলাসাতুস সিয়ার গ্রন্থে আছে, রাসূল (সা.)-এর ভ্রূ ঘন ও পৃথক পৃথক ছিল ।
(আর-রাহীকুল মাখতুম ৭৫২ পৃষ্ঠা)

گھنے باریک اورخم دار تھے مثل کمان ابرو☆ذرا کچھ فصل سے دونوں ہلال ضوفشاں ابرو

ঘন, মিহিন, ভ্রূ ছিল তাঁর, কামানের মত বাঁকা,
উজ্জ্বল দু'টি হেলাল যেন মাঝে একটু ফাঁকা ।

رگ پاک اک دونوں ابروؤں کے درمیاں میں تھی☆جوغصہ میں ابھر آتی تیر اک دوکماں میں بھی

ভ্রু যুগলের মধ্যখানে ছিল একটি ধমনী,
রাগের সময় উঠত ভেসে তীর থাকে যেমন কামানে ।
রাসূল (সা.)-এর মাথার কেশ মোবারক কেমন ছিল ঃ
হযরত আনাস (রাযি.) থেকে বর্ণিত আছে, রাসূল (সা.)-এর মাথার কেশ মোবারক এত বেশি কোঁকড়ানো ছিল না যে, দেখতে অসুন্দর দেখায় । আবার এত সোজাও ছিল না । বরং হালকা কোঁকড়ানো এবং নূপুরের মত আঁকা বাঁকা ধরনের ছিল ।
(শামায়েলে তিরমিযী, বুখারী ১ম খন্ড, ৫০২ পৃষ্ঠা)
এমনিভাবে উম্মে মা'বাদ খাযাঈয়ার (রাযি.) বর্ণনা হল, তাঁর কেশ মোবারক চমৎকার ও খুব কালো ছিল । (আর-রাহীকুল মাখতুম ৭৫১ পৃষ্ঠা)
হযরত আলী (রাযি.) প্রিয় নবীজির (সা.) দৈহিক গঠনের বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন, তাঁর কেশ মোবারক খুব বেশি কোঁকড়ানোও ছিল না, আবার একেবারে সোজাও ছিল না বরং হালকা কোঁকড়ানো ছিল । (শামায়েলে তিরমিযী)
চুল রাখার ক্ষেত্রে রাসূল (সা.)-এর অভ্যাস ঃ
খাসায়েলে নববীতে আছে, তিনি অল্প কয়েকবার মাত্র মাথা মুন্ডিয়েছেন বলে প্রমাণ পাওয়া যায় । তা ছাড়া অধিকাংশ সময় চুল রাখতেন । তবে চুলতো আর সর্বদা এক অবস্থায় থাকার বস্তু নয়, বরং কখনো ছোট থাকত, কখনো বেড়ে যেত । এমনিভাবে কখনো ইচ্ছাকৃতভাবে ছোট করা হত । (ছোট রাখতেন) । এ জন্য
له شعر يبلغ شحمة اذنيه

রাসূল (সা.)-এর কেশ বড় রাখার বর্ণনা পাওয়া যায় । বুখারী শরীফে হযরত বারা ইবনে আযেব (রাযি.)-এর বর্ণনা যে, রাসূল (সা.)-এর মোবারক কেশ কান পর্যন্ত আসত ।
(বুখারী ১ম খন্ড, ৫০২ পৃষ্ঠা)
২য় অবস্থা হযরত আয়েশা (রাযি.) বর্ণনা করেন যে, আমি এবং রাসূল (সা.) একই পাত্র থেকে গোসল করতাম । তাঁর কেশ মোবারক কানের লতি থেকে একটু নীচে ছিল, কাঁধ পর্যন্ত যায়নি, বরং কান ও কাঁধের মাঝামাঝি ছিল । (শামায়েলে তিরমিযী) । আর এই অবস্থাটা হযরত আনাস (রাযি.) হতে মুসলিম শীরফে বর্ণিত আছে ।
(মুসলিম শরীফ ১ম খন্ড, ২৫৮ পৃষ্ঠা)
তৃতীয় অবস্থা হযরত বারা (রাযি.)-এর দ্বিতীয় বর্ণনায় আছে যে, له شعريضرب منكبيه
পূর্ণ হাদীসের তরজমা হল- আমি কোন বাবরীওয়ালাকে লাল জোড়ায় প্রিয় নবী (সা.) হতে অধিক সুন্দর দেখি নাই । তাঁর কেশ মোবারক ঘাড় পর্যন্ত পৌঁছে ছিল ।
(শামায়েলে তিরমিযী, বুখারী ২য় খন্ড, ৮৭৬ পৃষ্ঠা)
রাসূল (সা.) সাদা রেখাযুক্ত লাল রংয়ের জামা পরিধান করতেন । যা দূর থেকে লাল রংয়ের জামা বলেই প্রতিয়মান হত । এই জন্য লাল জামার কথাটা প্রচলন হয়ে গেছে । অথচ গাঢ় লাল রংয়ের জামা পরিধান করা হানাফী মাযহাব অনুসারে পুরুষের জন্য মাকরূহ । কবি মুযতারের অপূর্ব মূল্যায়ন ঃ

سئیہ گنجان گیسوں جس پر صدقے ہوں دل و دیدہ ☆ ذرا مائل بہ خم بالکل نہ سیدھے ہی نہ پیچیدہ

ঘন কালো কেশের উপর কোরবান সবার চোখ ও হৃদয়,
একটুখানি কুঞ্চিত কেশ বক্র সোজা খুব বেশি নয় ।

درازی میں پہونچ جاتے تھے نیچے کان کی لو سے ☆ درخشاں مانگ روشن کہکشاں ہے جسکے پرتو سے

বাবরী চুলের দৈর্ঘ খানি পৌঁছে যেত কানের নিচে,
যার ছায়াতে আলো খুঁজে কুল মাখলুক পথ পেয়েছে ।
প্রিয় নবীর (সা.) ঘাড় মোবারক ঃ
তাঁর ঘাড় মোবারক অত্যন্ত পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন ছিল । হিন্দ ইবনে আবি হালা (রাযি.) রাসূল (সা.)-এর দেহাবয়ব সম্পর্কে বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন, তাঁর ঘাড় মোবারক এত সুন্দর ও সূক্ষ্ম ছিল, যেমন কোন ভাস্কার্যের গর্দান । (শামায়েলে তিরমিযী)
মূর্তি বা ভাস্কার্যের গর্দানের দৃষ্টান্ত এ জন্য দেয়া হয়েছে, যে ভাস্কার্যের শিল্পী (আবিস্কারক) এটাকে কাটছাঁট করার মধ্যে তাঁর পূর্ণ কারিগরি ও দক্ষতার প্রমাণ দিয়ে থাকে । আর বিশ্ব জাহানের স্রষ্টা মহান আল্লাহ যিনি على كل شئى قدير (সর্বময় ক্ষমতার আধার) فعال لما يريد (যা ইচ্ছা তাই করেন) তিনি তাঁর শ্রেষ্ঠ বন্ধুর ছবি

আঁকবেন, তাহলে কত নিপুঁন, নিখুঁত ও দৃষ্টিনন্দন করে এঁকে থাকবেন, তাতো সূর্যোলোকের ন্যায় স্পষ্ট। এ কথা আগেই বলা হয়েছে যে, এসব উপমা উদাহরণ, দৃষ্টান্ত কেবল বুঝানোর জন্য, অথচ (মূর্তি) ভাস্কার্য-এর সৌন্দর্যতার সাথে নবীর নান্দনিকতার কি তুলনা হতে পারে! কবি মুযতার বলেন ঃ

بلند و دلفریب و خوش نما تھی آپ کی گردن ☆ بت سیمیں کی جیسے ہو تراشی یا ڈھلی گردن

মন ভুলানো অতি সুন্দর উন্নত ছিল নবীর গ্রীবা
যেন সোমনাথ দেবীর খোদাইকৃত মসৃন সুন্দর গ্রীবা।

রাসূল (সা.)-এর কাঁধ মোবারক ঃ

যাদুল মা'য়াদ ২য় খন্ড, ৫৪ পৃষ্ঠায় হযরত আলী (রাযি.) হতে বর্ণিত আছে, প্রিয় নবীজির (সা.) উভয় স্কন্ধের হাড়সমূহ বড়সড় ছিল। (আর-রাহীকুল মাখতুম ৭৫২ পৃষ্ঠা)

হযরত আলী (রাযি.) বর্ণনা করেন, তাঁর উভয় স্কন্ধের মধ্যের স্থান মোটা গোশতে পরিপূর্ণ ছিল। (শামায়েলে তিরমিযী) شعر المنكبين

হযরত হিন্দ ইবনে আবি হালা (রাযি.) বর্ণনা করেন, রাসূল (সা.)-এর উভয় স্কন্ধের উপরের অংশে পশমও ছিল। (শামায়েলে তিরমিযী)

হযরত বারা ইবনে আযেব (রাযি.) বলেন, প্রিয় নবী (সা.)-এর কাঁধের মধ্যে একটু দূরত্ব ছিল। (বুখারী ১ম খন্ড, ৫০২ পৃষ্ঠা) عريض الصدر

রাসূল (সা.)-এর বক্ষ মোবারক ঃ

হযরত বারা (রাযি.)-এর রেওয়ায়েতে যা বুখারী শরীফে বর্ণিত হয়েছে, প্রিয় নবী (সা.)-এর মধ্যভাগ একটু দূরত্ব ছিল। এর দ্বারা সীনা মোবারক প্রশস্ত হওয়া বুঝা যায়। এমনিভাবে হিন্দ ইবনে আবি হালা (রাযি.) বলেন, তিনি
অর্থাৎ প্রশস্ত বক্ষের অধিকারী ছিলেন এবং তাঁর বক্ষের উপরি অংশে পশমও ছিল। তবে উভয় স্তন পশম শূন্য ছিল। (শামায়েলে তিরমিযী)

রাসূল (সা.)-এর পেট মোবারক ঃ

হিন্দ ইবনে আবি হালা (রাযি.) বর্ণনা করেন, তিনি سواء البطن والصدر পেট ও বক্ষের সমতল স্থুল দেহের অধিকারী ছিলেন। মেদভুড়ি সম্পন্ন ছিলেন না। (শামায়েলে তিরমিযী)

এমনিভাবে উম্মে মা'বাদ খাযাঈয়া (রাযি.) যিনি তাঁর স্বামীর নিকট রাসূলের (সা.) দৈহিক বিবরণ দিচ্ছিলেন, তিনি বলেন, তাঁর মধ্যে মেদভুড়ির ত্রুটি ছিল না, বরং তাঁর দেহ মোবারক সারা জাহানের সৌন্দর্যের দীপ্তি ছড়ানো এক অপূর্ব ছবি ছিল। অর্থাৎ কোন অপূর্ণতা ও ত্রুটি ছিল না যে, দেখতে অসুন্দর দেখাবে।

হযরত আলী (রাযি.) ও হিন্দ ইবনে আবি হালা (রাযি.) উভয়ের বর্ণনা যে, তাঁর গলা (কণ্ঠনালী) হতে নাভি পর্যন্ত বক্ষ ও পেটের মাঝখানে পশমের একটি সূক্ষ্ম রেখা ছিল। যেমনিভাবে ছড়ি (লাঠি) হয়ে থাকে। এ ছাড়া পেট মোবারকে পশম হতে সম্পূর্ণ পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন ছিল।
(শামায়েলে তিরমিযী)
এই বিষয়টির বর্ণনা কবি মুযতার-এর ভাষায় ঃ

تھے چورے دونوں شانے فصل کچھ ان میں زیادہ تھا☆ذرا ابھرا ہوا تھا سینہ پاک اور کشادہ تھا

স্কন্ধ ছিল জোড়া মিলানো একটুখানি দূরত্বও
হৃষ্টপুষ্ট বক্ষ ছিল বড়সড় প্রশস্তও।

شکم اور سینہ ہموار ایک نمائش تھی جمالونکی☆تھی سینے سے لکیر ایک ناف تک باریک بالوں کی

সীনা ও পেট সমান ছিল সুন্দর দেহ রং বাহারী
বক্ষ হতে নাভীর উপর হালকা পশম সারিসারি।

تھے کچھ بال اوپری حصہ میں بازو اور سینے کے☆بقیہ کل بدن بے بال تھا مثل آبگینے کے

বাহুবক্ষের মাঝামাঝি আরও কিছু পশম ছিল,
এ ছাড়া লোম ছিল না, আয়নার মত স্বচ্ছ ছিল।

রাসূল (সা.)-এর বাহু ও কব্জি মোবারক ঃ

হিন্দ ইবনে আবি হালা (রাযি.) নবীজির দেহাবয়ব বর্ণনা করতে যেয়ে বলেন, তিনি اشعر الذراعين ছিলেন। অর্থাৎ উভয় বাহু পশমবিশিষ্ট ছিল। এবং বলেন, তিনি طويل الندندين অর্থাৎ লম্বা কব্জিবিশিষ্ট ছিলেন। এমনিভাবে 'খোলাসাতুস সিয়ারে' আছে যে, তাঁর কব্জিগুলি লম্বা ও বড়সড় ছিল। (আর-রাহীকুল মাখতুম ৭৫৬ পৃষ্ঠা) আর এটা শক্তিশালী হওয়ার নিদর্শন।

রাসূল (সা.)-এর হস্ত মোবারক ঃ

হিন্দ ইবনে আবি হালা (রাযি.) বলেন, নবী কারীম (সা.)-এর হস্তদ্বয় প্রশস্ত, গোশতে পরিপূর্ণ ও নরম ছিল। (শামায়েলে তিরমিযী)
হযরত আনাস (রাযি.) যিনি প্রিয় নবীজির (সা.) বিশেষ খাদেম ছিলেন, তিনি বর্ণনা করেন, আমি নবী (সা.)-এর হস্তদ্বয়ের তুলনায় অধিক নরম রেশমী কাপড়, খাঁটি রেশম অথবা কোন নরম বস্তু কখনো স্পর্শ করি নাই। (বুখারী ১ম খন্ড, ৫০৩ পৃষ্ঠা)

রাসূল (সা.)-এর হাতের আঙ্গুলীসমূহ ঃ

হিন্দ ইবনে আবি হালা (রাযি.) বলেন, প্রিয় নবী (সা.)-এর আঙ্গুলসমূহ একই ধরনের লম্বা ছিল। (শামায়েলে তিরমিযী) অর্থাৎ অন্য লোকদের তুলনায় একটু

লম্বা ধরনের ছিল । হ্যাঁ, তবে সীমাতিরিক্ত লম্বা ছিল না যে, অসুন্দর দেখা যায় এবং আঙ্গুলের জোড়া শক্ত ও বড় ছিল ।

হযরত আলী ও হিন্দ ইবনে আবি হালা (রাযি.) উভয়ের বর্ণনা যে, তাঁর জোড়ার হাড় মোটাসোটা ছিল । (শামায়েলে তিরমিযী) এই উভয় বিষয়টিকে অতি সুন্দরভাবে উপস্থাপন করেছেন কবি মুযতার ঃ

کف دست اور پنجے پائے اطہر کے کشادہ تھے☆ گداز ونرم دیبا اور ریشم سے زیادہ تھے

হাতের তালু পায়ের পাঞ্জা বড় ছিল প্রশস্ত,
রেশমের চেয়েও মোলায়েম ছিল নবীজির নরম হস্ত ।

کلاں تھی ہڈیاں مربوط اور پرگشت تھے اعضاء☆ تھے لانبے ہاتھ لمبی انگلیاں متناسب وزیباں

মজবুত হাড়ের কব্জি ছিল অঙ্গ ছিল গোশতে ভরা,
দীর্ঘ হস্ত বড় আঙ্গুল যথার্থ সুন্দর দেহটা গড়া ।

প্রিয় নবীজির (সা.) বগল মোবারক ঃ

প্রিয় নবীজির (সা.) বগলদ্বয় একেবারে পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন এবং উজ্জ্বল ছিল । হযরত আনাস (রাযি.) বলেন, 'ইস্তেস্কা'-এর দোয়ার সময় রাসূল (সা.)-এর হাত এত উপরে উঠে গিয়েছিল যে, তাঁর বগল মোবারকের শুভ্রতার প্রভা ছড়াচ্ছিল । এমনিভাবে হযরত আবু মুসা আশআরী (রাযি.) বর্ণনা করেন, তিনি একদা দোয়ার জন্য হাত উঠালেন তো হাত এত উপরে উঠালেন যে, তাঁর বগল দৃষ্টিগোচর হতে লাগল । (বুখারী ১ম খণ্ড, ৫০৩ পৃষ্ঠা)

সাদা (শুভ্র) হওয়াটা এ দিকে ইঙ্গিত প্রদান করে যে, তাঁর বগলে পশম ছিল না । হয়ত কুদরতীভাবেই ছিল না অথবা তিনি বগলের পশম উঠানোর ক্ষেত্রে খুব গুরুত্ব প্রদান করতেন । (একটু হলেই সাথে সাথে উঠিয়ে ফেলতেন, বড় হতে দিতেন না) । যাহোক বগল মোবারক পরিচ্ছন্ন ও চমকপ্রদ ছিল । (বুখারী শরীফ ১ম খণ্ড, ৫০৩ পৃষ্ঠা)

এই বিষয়টির বিবরণ দিতে গিয়ে কবি মুযতার সাহেবের ছন্দের অলংকার ঃ

بغل میں تھی سفیدی جسم اطہر کی طرح تاباں☆ بدن تھا مشک وعنبر سے بھی خوشبودار بے پایاں

বগলেও ছিল শুভ্রতা পবিত্র দেহের ন্যায় শোভাময়
মেশক আম্বর হতে সুরভীত দেহ সীমাহীন প্রভাময় ।

নবী (সা.)-এর পায়ের নলী ও গোড়ালী মোবারক ঃ

হযরত জাবের (রাযি.) বর্ণনা করেন, রাসূল (সা.)-এর নলী মোবারক হালকা ধরনের ছিল। তাঁর নলী মোবারকে পশমও ছিল। (শামায়েলে তিরমিযী)

এটা পুরুষের ক্ষেত্রে ভাল গুণ হিসেবে বিবেচিত হয়ে থাকে। আর নারীদের পায়ের নলী মোটা হওয়া এবং পশমশূন্য হওয়া সৌন্দর্যের প্রতীক। কিন্তু পুরুষদের ক্ষেত্রে নলী হালকা হওয়াটাই প্রশংসার।

আউন ইবনে আবি হুজাইফা (রাযি.) একটি ঘটনা বর্ণনা করেন, একদা রাসূল (সা.) তাবু হতে বাইরে গমন করলেন, আর তাঁর নলী মোবারক চমকাতে ছিল। আমি যেন এখনো নবীজির (সা.) নলীর চমক (দীপ্তি) অবলোকন করছি।

(বুখারী ১ম খন্ড, ৫০৩ পৃষ্ঠা)

কবি মুযতার ছন্দে ছন্দে এই আবেগের বহিঃপ্রকাশ ঘটালেন এভাবে ঃ

تھیں پتلی پنڈلیاں ہموار اور شفاف زیبیدہ ☆ لطافت کا وہ عالم شاخ طوبی جس سے شرمندہ

হালকা পায়ের নলী ছিল নির্মল সমান শুভিত
সৌন্দর্যতার অবস্থা এমন যে,'তুবা শাখাও যাতে লজ্জিত।

রাসূল (সা.)-এর কদম মোবারক ঃ

হযরত আলী (রাযি.) বর্ণনা করেন, নবী কারীম (সা.)-এর কদম মোবারক মোলায়েম এবং গোশতে পূর্ণ ছিল।

হিন্দ ইবনে আবি হালা (রাযি.)-এর বর্ণনা যে, তাঁর পা মোবারক গোশতে পরিপূর্ণ হওয়ার সাথে সাথে সমান চর্বিযুক্ত ছিল। তাঁর পা মোবারক পিছলা ও চর্বিযুক্ত হওয়ার দরুন পানি ঢাললে মুহূর্তেই তা গড়িয়ে পড়ত, স্থির থাকত না। (শামায়েলে তিরমিযী)

পদযুগল গোশতে পরিপূর্ণ থাকা পুরুষের জন্য অত্যন্ত প্রশংসিত গুন, নারীদের ক্ষেত্রে নয়।

রাসূলের (সা.) পায়ের আঙ্গুলসমূহ ঃ

রাসূল (সা.)-এর পায়ের আঙ্গুলসমূহ সমানভাবে অন্যদের তুলনায় একটু লম্বা ছিল। যেমনটা আঙ্গুলের ক্ষেত্রে উল্লেখ করা হয়েছে।

নবীজির (সা.) পায়ের তলা মোবারক ঃ

হিন্দ ইবনে আবি হালা (রাযি.) বর্ণনা করেন, রাসূল (সা.)-এর পায়ের তলা ক্ষাণিকটা গর্ত ছিল।
(শামায়েলে তিরমিযী, খুলাসাতুস সিয়ার ২১৯ পৃষ্ঠা)

প্রিয়নবী (সা.)-এর দেহাবয়বের বর্ণনায় আছে তাঁর পায়ের তলা খালি ছিল।
(আর-রাহীকুল মাখতুম ৭৫৬ পৃষ্ঠা)

قدم آیئنہ سا قطرہ نہ پانی کا ذرا ٹھہرے ☆ تھیں کم گوشت اور ہلکی ایڑیاں تلوے ذرا گہرے

রাসূল (সা.)-এর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের জোড়াসমূহ ঃ

রাসূল (সা.)-এর জোড়ার অবস্থা বর্ণনা করতে গিয়ে হিন্দ ইবনে আবি হালা (রাযি.) এবং হযরত আলী (রাযি.) উভয়ে বর্ণনা করেন, রাসূল (সা.) ضخم الكراديش

অন্যস্থানে جليل المشاش অর্থাৎ জোড়ার হাড়সমূহ মযবুত ও বড়সড় ছিল। এটা শক্তি-সামর্থের নিদর্শন। (শামায়েলে তিরমিযী)

খোলাসাতুস সিয়ারে আছে, রাসূল (সা.)-এর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ বড়সড় ছিল। (আর-রাহীকুল মাখতুম)

রাসূল (সা.)-এর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের পশম মোবারক ঃ

হযরত আলী (রাযি.) বর্ণনা করেন, প্রিয়নবী (সা.)-এর দেহ মোবারকে স্বাভাবিকতার অধিক পশম ছিল না। (শামায়েলে তিরমিযী) কোন কোন লোকের দেহে প্রচুর পশম হয়ে থাকে। রাসূল (সা.)-এর দেহ মোবারকের কোন কোন অংশে পশম ছিল। আবার কোন কোন অংশ একেবারে পশমশূন্য ছিল। পবিত্র দেহের যে সকল স্থানে পশম ছিল, বিভিন্ন বর্ণনামতে সে স্থানসমূহ হল (১) বাহুদ্বয়। (২) উভয় পায়ের নলী। (৩) উভয় স্কন্ধ। (৪) বক্ষের উপরাংশ। (৫) কণ্ঠনালী হতে নাভী পর্যন্ত একটি সূক্ষ্ম রেখার মত ছিল। মুযতার তার কবিতায় ঃ

تھے کچھ بال اوپری حصہ میں بازو اور سینے کے☆بقیہ کل بدن بے بال تھا مثل آ بگینے کے

বাহু, বক্ষের উপরি অংশে পশম ছিল প্রিয় নবীজির,
আয়নার মত স্বচ্ছ ছিল বাকী দেহ প্রিয় নবীজির।

রাসূল (সা.)-এর পাকা চুল ঃ

হযরত আনাস (রাযি.) বর্ণনা করেন- অর্থাৎ রাসূল (সা.)-এর চুলসমূহের মধ্যে সাদা (পাকা) বেশি ছিল না। মাত্র কয়েকটি চুল পেকে সাদা হয়েছিল।
(মুসলিম শরীফ ২য় খন্ড, ২৫৯ পৃষ্ঠা)

হযরত জাবের ইবনে সামুরা (রাযি.)-এর নিকট জানতে চাওয়া হয়েছিল যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কয়টি চুল সাদা হয়েছিল? প্রতি উত্তরে তিনি বলেন (এগুলির সংখ্যা) এত স্বল্প ছিল যে, যখন রাসূল (সা.) (মাথায়) তেল ব্যবহারে করতেন, তখন অনুভবই করা যেত না। আর যখন তেল ব্যবহার করতেন না, তখন বুঝা যেত (অনুভব করা যেত)। (মুসলিম শরীফ ২য় খন্ড, ২৫৯ পৃষ্ঠা)
এ কথার দ্বারা এটাই উদ্দেশ্য যে, মাত্র অল্প কয়টা কেশই সাদা হয়েছিল। কিন্তু

কয়টি ছিল। এর সংখ্যা কেউ কম কেউ বেশি বলেছেন। তবে বিশটার অধিক কোন হাদীস দ্বারা প্রমাণিত নয় এবং ১৪ টার কমও প্রমাণিত নয়। ১৪টা হতে ২০টার মাঝামাঝি ছিল। তারপর যে সাহাবীর যতটা জানা ছিল তা বর্ণনা করেছেন। এটা সংখ্যার বেশকম (পার্থক্য) মাত্র।
হযরত আনাস (রাযি.) বর্ণনা করেন, আমি প্রিয় নবীজি (সা.)-এর মাথার কেশ ও দাড়ি মোবারকে ১৪টার অধিক সাদা চুল পাইনি। (এটা সর্বনিু পরিমাণ)।
হযরত ইবনে ওমর (রাযি.) বলেন, রাসূল (সা.)-এর সাদা চুল বিশটা ছিল। (এটা সর্বনিু পরিমাণ) (শামায়েলে তিরমিযী)
হযরত আনাস (রাযি.) বলেন, রাসূল (সা.)-এর অন্তিম দিনে (তিরোধানের সময়) ২০ টার অধিক চুল (পাকে নাই) সাদা হয় নাই। অর্থাৎ পাকা চুল ২০ টার চেয়ে কম ছিল। صدغين
(বুখারী ১ম খন্ড ৫০২)
রাসূল (সা.)-এর কোন কোন স্থানের কেশ সাদা হয়েছিল?
হযরত আনাস (রাযি.) বলেন, নবী কারীম (সা.)-এর কেশসমূহের মধ্যে কয়েকটি দাড়ি মোবারকে ছিল আর কয়কটি অর্থাৎ কানপট্টিতে কয়েকটি মাথায় ছিল।
(মুসলিম শরীফ ২য় খন্ড, ২৫৯ পৃষ্ঠা)
মূলকথা কথা হল, প্রথমত: সাদা চুলইতো ছিল মাত্র কয়েকটি, তাও আবার তিন স্থানে বিস্তৃত ছিল। কিছু মাথায় কিছু কানপট্টিতে কিছু দাড়িতে।
মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর মহ্‌রে নবুওয়তের আলোচনা
মহরে নবুওয়ত একটি মু'জিযা এবং "আলামতে নবুওয়ত"-এর (নবুওয়তের নিদর্শন) অন্তর্ভুক্ত। এর গুরুত্ব অনুধাবন করতঃ এটাকে আলাদাভাবে উল্লেখ করা হল। মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ খাতামুন্নাবিয়্যীন তথা শেষ নবী ছিলেন। এই জন্য মহান আল্লাহ তা'আলা রাসূল (সা.)-এর উপর "খতমে নবুওয়তের" মহর (সিল) অংকিত করে দিয়েছিলেন।
রাসূল (সা.)-এর মহরে নবুওয়ত দেহ মোবারকের কোন স্থানে ছিল ঃ
সায়েব ইবনে ইয়াজিদ (রাযি.) বলেন, আমি প্রিয়নবী (সা.)-এর পৃষ্ঠ মোবারকের দিকে ঘুরলাম। তখন আমি মহরে নবুওয়ত দেখতে পেলাম নবীজি (সা.)-এর দুই কাধের মাঝখানে। (বুখারী শরীফ ১ম খন্ড, ৫০১, মুসলিম শরীফ, ২য় খন্ড, ২৫৯ পৃষ্ঠা)
মহরে নবুওয়ত রাসূল (সা.)-এর পিঠে দুই স্কন্ধের মধ্যবর্তী স্থানে ছিল। তবে বাম কাঁধের হাড়ের একটু নিকটে ছিল। অর্থাৎ বাম দিকেইতো হৃদয় (قلب) হয়ে

থাকে। পিঠের উপর একেবারে হৃদপিন্ডের বিপরীতে ছিল।
আবদুল্লাহ ইবনে সারজাস (রাযি.) বলেন, আমি রাসূল (সা.)-এর সাথে খানাও খেয়েছি, তাঁর যিয়ারতও করেছি (তাঁর সান্নিধ্য লাভের আশায় তাঁর সাক্ষাত করেছি) তাঁর নিকট দোয়ার জন্য নিবেদন করেছি। এরপর যখন তাঁর দৃষ্টিপানে ঘুরলাম, তখন আমি মহরে নবুওয়ত দেখতে পেলাম তাঁর উভয় স্কন্ধের মধ্যবর্তী স্থানে। তা বাম কাঁধের নরম হাড়ের নিকটবর্তী ছিল। (মুসলিম শরীফ ২য় খন্ড, ২৬০ পৃষ্ঠা)
হযরত আলী (রাযি.) যখন রাসূল (সা.)-এর বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করতেন, তখন এটাও বর্ণনা করতেন যে, রাসূল (সা.)-এর উভয় স্কন্ধের মধ্যবর্তী স্থানে মহরে নবুওয়ত ছিল এবং তিনি শেষ নবী ছিলেন।
মহরে নবুওয়ত রাসূলের (সা.)-এর কাঁধে কখন থেকে? ملخص خصائل نبی صفـ ٢١
এবং কতদিন যাবৎ ছিল?
মহরে নবুওয়ত রাসূল (সা.)-এর দেহ মোবারকে জন্মের দিন হতেই ছিল। যার প্রমাণ "ফাতহুল বারী" গ্রন্থে হযরত আয়েশা (রাযি.)-এর হাদীস হতে বর্ণিত হয়েছে এবং মৃত্যু অবধি তা বিদ্যমান ছিল। এমনকি যখন প্রিয় নবীজির (সা.) তিরোধানের ব্যাপারে কতিপয় সাহাবা সন্দেহ পোষণ করতে লাগলেন, তখন হযরত আসমা বিনতে আবি বকর (রাযি.) হুজরা মোবারকে গমণ করত: মহরে নবুওয়ত দেখতে গেলেন, দেখলেন সেটা অদৃশ্য হয়ে গেছে। এর দ্বারা তিনি রাসূল (সা.)-এর (মৃত্যুর) তিরোধানের ব্যাপারে নিশ্চিত হয়েছিলেন এবং এটাকে প্রমাণ হিসেবে উপস্থাপন করেছিলেন।
রাসূলের মহরে নবুওয়তে কী লিখা ছিল?
ইবনে হিব্বান এটাকেই সঠিক বলেছেন যে, এতে লিখা ছিল (محمد رسول الله)
মুহাম্মাদুল রাসূলুল্লাহ (সা.)। অন্য বর্ণনামতে এর উপর লিখা ছিল سرفانت منصور
অর্থাৎ আপনি যেথায় খুশি যেতে পারেন, আপনাকে সাহায্য করা হবে। কিন্তু এ ব্যাপারে হাদীস বিশারদগণের নিকট সঠিক এবং অকাট্য বর্ণনা কোনটাই পাওয়া যায় না।
(খাসায়েলে নববী (সা.)
রাসূল (সা.)-এর মহরে নবুওয়তের ধরন ঃ
এর আকৃতির ব্যাপারে বিভিন্ন ধরনের বর্ণনা পাওয়া যায়। তবে এ ব্যাপারে কুরতুবী (রহঃ) একটি সুন্দর কথা বলেছেন যে, 'মহরে নবুওয়ত কম বেশী হতে থাকত। এমনকি এর বর্ণও পরিবর্তন হতে থাকত। এই জন্য যে সাহাবী যে অবস্থায় দেখেছেন, সে অনুযায়ী বর্ণনা করেছেন। ২য় কথা যা শায়খুল হাদীস মাওলানা যাকারিয়া (রহঃ) বলেছেন যে, কোন ব্যাক্তি যদি নতুন কোন বিষয়

দেখে, তখন এটাকে তার দৃষ্টিতে যার মত মনে হয়, তার সাথে তুলনা করে থাকে। এমনিভাবে মহরে নবুওয়তকে যে যেমন দেখেছেন, তেমনই বলেছেন।
(খাসায়েলে নববী ২৩ পৃষ্ঠা)
হযরত জাবের ইবনে সামুরা (রাযি.) বর্ণনা করেন, আমি তাঁর মহরে নবুওয়তকে উভয় স্কন্ধের মধ্যবর্তী স্থানে দেখলাম এর রং ছিল রক্তিম লালাভ ধরনের। এবং পরিমাণের দিক থেকে কবুতরের ডিম-এর সমান ছিল।
(শামায়েলে তিরমিযী, মুসলিম ২য় খন্ড, ২৫৯ পৃষ্ঠা)
সায়েব ইবনে ইয়াযিদ (রাযি.)-এর বর্ণনা যে, আমি দুই কাঁধের মাঝে মহরে নবুওয়তকে দেখলাম, যা (সাজানো) পালঙ্কের ঘন্টার সমান ছিল।
(বুখারী শরীফ ১ম খন্ড, ৫০১-৩১ পৃষ্ঠা)
আগের যুগে বাসর রাত্রে বর কনের জন্য একটি খাট-পালঙ্ক সাজানো হত, যার মধ্যে কাপড় দ্বারা ছোট্ট একটি ঘরের মত বানানো হত এবং এর উপরিভাগে (ছাদে) পর্দার মধ্যে কবুতরের ডিমের সমান এই ডিজাইনেই ছোট ছোট অনেক ঘুন্টি লাগানো থাকত সৌন্দর্যের জন্য। হাদীস শরীফে ঐ সব ঘুন্টির সাথেই মহরে নবুওয়তের তুলনা করা হয়েছে। এখন উভয়ের বর্ণনার মধ্যে কোন বিরোধ থাকল না। এভাবে যে, এর পরিমাণ, বুনন প্রণালী কবুতরের ডিমের সমানই ছিল। আর ঘুন্টি ও কবুতরের ডিম সমানই হয়ে থাকে। (ফয়জুল বারী) এবং এর চতুর্পার্শ্বে তিলের মত ছিল, যা মেসতার মত মনে হত।
(মুসলিম শরীফ ২য় খন্ড, ২৬০ পৃষ্ঠা)
তা ছাড়া মহরে নবুওয়তের চতুর্পার্শ্বে পশমও ছিল, যেমনটা আলবা বর্ণনা করেন যে, আমাকে উমর ইবনে আখতাব আনসারী (রাযি.) এই ঘটনা বর্ণনা করেছেন যে, একদা প্রিয়নবী (সা.) আমাকে কোলকুলী করার জন্য আহ্বান করলেন। আমি কোলাকুলি করতে আরম্ভ করলাম, তখন হঠাৎ মহরে নবুওয়তের উপর আঙ্গুল স্পর্শ করল। তখন আলবা জিজ্ঞেস করল যে, মহরে নবুওয়ত কী? তখন উমর ইবনে আখতাব প্রতিউত্তরে বললেন যে, এটা পশমের একটি জমাট ছিল। (শামায়েলে তিরমিযী)
যেহেতু তাঁর হস্ত পশমে স্পর্শ করেছিল, তাই বর্ণনা করেছিল যে, পশমের সমষ্টি ছিল। কবি মুযতার-এর ভাষায় ঃ
میان ہر دو شانہ پشت پر مہر نبوت تھی ☆ کبوتر کے جوانڈے کی طرح تھی سرخ رنگ تھی
দু'কাঁধের মাঝে পিঠের উপর নবুওয়তের মহর ছিল,
কবুতরের ডিমের সমান লাল রঙ্গের মহর ছিল।
وہ کب کے آئے بھی اور گئے بھی نظر میں ابتک سما رہے ہیں ☆ یہ چل رہے ہیں وہ پھر رہے ہیں یہ آ رہے ہیں وہ جا رہے ہیں

সে যে কবে এসেছিল আবার চলেও গেল সদা ভাসমান চোখে তাঁরই ছবি।
তাঁর আসা যাওয়া তাঁর চলাফেরা সব কিছুই তাঁর অনুভব করি।
প্রিয় নবীজির (সা.) বিশেষ অঙ্গসমূহের আলোচনা পবিত্র কুরআনে ঃ
আল্লামা আবদুর রউফ মুনাবী (রহঃ) লিখেন যে, এমনিতেই তো রাসূল (সা.)-এর অসংখ্য অনন্য বৈশিষ্ট্যসমূহ রয়েছে। তন্মধ্যে এটাও একটা অন্যতম বৈশিষ্ট্য যে, মহান আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কুরআনে প্রিয়নবী (সা.)-এর অঙ্গসমূহের পৃথক পৃথক আলোচনা করেছেন। (১) অত:পর পবিত্র চেহারা মোবারকের আলোচনা করতে যেয়ে আল্লাহ তা'আলা বলেন, قد نرى تقلب وجهك - فول وجهك
এই দুই স্থানে শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। অর্থাৎ আপনার চেহারা। (২) নয়নযুগলের আলোচনায় আল্লাহ তা'আলা বলেন, এই দুই আয়াতে
অর্থ চোখ।
(৩) তাঁর জিভ মোবারকের আলোচনায় আল্লাহ তা'আলা বলেন,
অন্য আয়াতে রয়েছে উভয় আয়াতে জবান অর্থাৎ জিভের কথা আলোচনা করা হয়েছে।
(৪) হাত ও গরদান মোবারকের আলোচনায় আল্লাহ তা'আলা বলেন,
এই আয়াতে অর্থ হাত। অর্থ গরদান।
(৫) বক্ষ ও পৃষ্ঠ মোবারকের আলোচনায় আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

উক্ত আয়াতে অর্থ সীনা (বক্ষ) অর্থ পিঠ (পৃষ্ঠ)।
(৬) কলব তথা হৃদয় মোবারকের আলোচনায় আল্লাহ তা'আলা বলেন,
উক্ত আয়াতে শব্দের অর্থ হৃদয়। (মুনাবী আলা হাশিয়া জামউল ওয়াঃ ৪৫ পৃষ্ঠা)
প্রিয়নবী (সা.)-এর (লিবাস) পোশাক-পরিচ্ছদের বর্ণনা ঃ
অধিকাংশ সময় রাসূল (সা.)-এর পরনে লুঙ্গী ও চাদর থাকত। যা খুব শক্ত ও মোটা হত। মাদারিজুন নবুওয়ত গ্রন্থে আছে যে, রাসূল (সা.) ময়লা ও দুর্গন্ধযুক্ত বস্ত্র অপছন্দ করতেন।
(উসওয়ায়ে রাসূল (সা.) ১১৯ পৃষ্ঠা)
হযরত সামুরা ইবনে জুনদুব (রাযি.) বর্ণনা করেন, নবী আকরাম (সা.) বলেছেন,

সাদা বস্ত্র পরিধান কর, কেননা এটা অত্যন্ত পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন থাকে। আর এর দ্বারাই (সাদা কাপড়) তোমরা মৃত ব্যক্তিদের দাফন কর। (শামায়েলে তিরমিযী)
যাদুল মা'আদে আছে, তিনি ইয়ামানী চাদর, জোব্বা, আলখেল্লা, জামা, লুঙ্গী ইত্যাদি সব বস্ত্র ব্যবহার করতেন। তিনি রেখা পাইরযুক্ত কালো বস্ত্র এবং সাদা বস্ত্র পরিধান করেছেন।
(উসওয়ায়ে রাসূল)
পোশাকের বর্ণনায় কবি মুযতারের অনন্য বাক্য বিন্যাস ঃ

لباس اکثر رہا کرتا سفید اور کھر درا موٹا ☆ جو ہوتا نصف پنڈلی تک نہ لانبا ہی نہ تھا چھوٹا

کبھی پوشش تھی لنگی اور چادر دھاریوں والی ☆ کبھی کملی بھی جسم پاک پر اوڑھے ہوئے کالی

অধিক সময় পরতেন তিনি সাদা, মোটা আরামহীন কাপড়,
লম্বা খাটো খুব বেশী নয়, গোড়ালী হতে একটু উপর।

পরিধানে তাঁর লুঙ্গী হত, পাইরযুক্ত বড় চাদর,
কালো কম্বল জড়াতেন কভু পবিত্র দেহের উপর।
রাসূল (সা.)-এর জামা মোবারক ঃ
মোল্লা আলী ক্বারী (রহঃ) দিময়াতী (রহঃ) হতে বর্ণনা করেন, প্রিয়নবীর (সা.) জামা সুতি কাপড়ের বানানো ছিল, যা খুব লম্বা ছিল না এবং এর আস্তিনও ছিল না। এমনিভাবে মুনাবী (রহঃ) ইবনে আব্বাস (রাযি.) হতে বর্ণনা করেন, তাঁর জামা টাখনুর (গোড়ালীর) একটু উপরে থাকত। (খাসায়েলে নববী ৪৯ পৃষ্ঠা)
প্রিয় নবীর (সা.) জামার প্লেট বক্ষের উপরে থাকত। (বুখারী ৮৬২ পৃষ্ঠা)
শামায়েলে তিরমিযীতে আছে, তাঁর জামার প্লেট বক্ষের উপরে থাকত। যখন জামার প্লেট খোলা রাখতেন, তখন সীনা মোবারক পরিস্কার দৃষ্টিগোচর হত এবং এই অবস্থায় তিনি নামায আদায় করে নিতেন। (শামায়েলে তিরমিযী)
হযরত আসমা (রাযি.) বলেন, রাসূলের (সা.) জামার হাতা কব্জি পর্যন্ত হত।
(শামায়েলে তিরমিযী)
এছাড়াও আলখেল্লার হাতা কব্জির আগ পর্যন্ত বানিয়েছিলেন। এটা এ কথা বুঝানোর জন্য কব্জির আগ পর্যন্ত হাত বানিয়েছেন। অন্যথায় উত্তম ও সুন্নত হল হাতা কব্জি পর্যন্ত হওয়া। তবে এর একটু আগ পর্যন্ত হওয়াটাও জায়েয। কিন্তু হাতা লম্বার পরিমাণ আঙ্গুল অতিক্রম করা চাই।
জামার লম্বার ব্যাপারে আল্লামা শামী (রহঃ) লিখেন, জামা পায়ের নলীর অর্ধেক পর্যন্ত হওয়া চাই; এর বেশী নয়। এটাই উত্তম। তাছাড়া টাখনু পর্যন্তও জায়েয; কিন্তু অনুচিত। নবী কারীম (সা.) জামার হাতা খুব চিপাও রাখতেন না আবার খুব

ঢিলাও রাখতেন না, বরং মাঝামাঝি ধরনের রাখতেন এবং জামার হাতা কব্জি পর্যন্ত লম্বা হত। আলখেল্লাহর হাতার চেয়েও বর্ধিত হত। তবে আঙ্গুল অতিক্রম করত না।
(উসওয়ায়ে রাসূ (সা.) ১২২ পৃষ্ঠা)
রাসূল (সা.)-এর চাদর মোবারকের দৈর্ঘ্য-প্রস্ততা ঃ
রাসূল (সা.)-এর চাদর মোবারক চার হাত লম্বা ও আড়াই হাত প্রশস্ত ছিল। অন্য এক বর্ণনা মতে ছয় হাত লম্বা ও সাড়ে তিন হাত প্রশস্ত ছিল। (খাসায়েলে নববী ৯৫ পৃষ্ঠা)
নবীজি (সা.) কালো কম্বলও গায়ে জড়াতেন। হযরত আয়েশা (রাযি.) বর্ণনা করেন, একদা তিনি সকাল সকাল বাইরে গমন করলেন, তখন তাঁর গায়ে কালো পশমের একটি চাদর ছিল।
(মুসলিম শরীফ ২য় খন্ড, ১৯৪ পৃষ্ঠা)
রাসূল (সা.)-এর টুপি মোবারক ঃ
তিনি সাদা রঙ্গের টুপি ব্যবহার করতেন। কিন্তু সফর ও নিজ বাড়ীতে অবস্থানকালে টুপির ধরন ভিন্ন হত। তিনি যখন বাড়ীতে অবস্থান করতেন, তখন মাথায় চেপ্টা ধরনের টুপি ব্যবহার করতেন। এমনকি তিনি কারুকার্যখচিত গাঢ় টুপিও ব্যবহার করতেন। আর যখন সফরে থাকতেন, তখন উঁচু ধরনের (বর্ডার)প্রান্ত সিসাযুক্ত টুপি ব্যবহার করতেন। এটাকে কখনো কখনো সফরেই নামাযের সুতরা হিসেবে ব্যবহার করতেন।
(উসওয়ায়ে রাসূল (সা.) ১২৪ পৃষ্ঠা, সীরাজুম মুনির নববী লায়ল ও নাহার ১১১ পৃষ্ঠা)
রাসূল (সা.)-এর পাগড়ী মোবারক ঃ
রাসূল (সা.) অধিকাংশ সময় পাগড়ী ব্যবহার করতেন আর বলতেন, 'পাগড়ী ব্যবহার কর, এর দ্বারা ভদ্রতা বাড়ে'। কখনো যদি পাগড়ী না হত, তখন শির ও ললাটের মাঝে একটি পট্টি হলেও বেঁধে নিতেন।
নবীজির পাগড়ী মোবারকের রঙ্গ ঃ
হযরত আমর ইবনে হারিস (রাযি.) বলেন, ঐ দৃশ্যটা যেন এখনো আমার চোখের সামনে ভাসমান, যখন নবীজি (সা.) মিম্বরে খুতবা প্রদান করছিলেন এবং কালো রঙ্গের একটি পাগড়ী রাসূল (সা.)-এর (শির) মাথায় বাঁধা ছিল। (মুসলিম, নাসায়ী)
হযরত জাবের (রাযি.) বলেন, মক্কা বিজয়ের দিন যখন তিনি মক্কা শরীফে প্রবেশ করলেন, তখন তাঁর মাথায় কালো রংয়ের পাগড়ী ছিল। (শামায়েলে তিরমিযী)
রাসূল (সা.)-এর শামলা (পাগড়ীর প্রান্তস্থিত কারু)
শামলা প্রায় অর্ধ হাত লম্বা রাখতেন। অধিকাংশ সময় শামলা ছেড়ে পাগড়ী বাঁধতেন এবং শামলাকে উভয় স্কন্ধের মাঝামাঝি পেছনের দিকে ছেড়ে রাখতেন।

(খাসায়েলে নববী, নববী লায়ল ও নাহার, ৪১১ পৃষ্ঠা)
আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাযি.) বলেন, রাসূল (সা.) যখন পাগড়ী বাঁধতেন, তখন শামলাকে উভয় স্কন্ধের মাঝামাঝি পেছনে ঢেলে দিতেন। (শামায়েলে তিরমিযী) পাগড়ী মোবারক প্রায় সাত গজ লম্বা ছিল। (খাসায়েলে নববী, নববী লায়ল ও নাহার)

রাসূল (সা.)-এর মাথা মোবারকে কাপড় রাখার আলোচনা ঃ

হযরত আনাস (রাযি.) বলেন, তিনি প্রায়ই মাথায় কাপড় রাখতেন। তাঁর এই কাপড়খানা অধিক তৈল লাগার কারণে তৈলযুক্ত কাপড় বলেই মনে হত। (শামায়েলে তিরমিযী) এই কাপড়টা পাগড়ীর নিচে রাখতেন, যাতে তৈলের দরুন পাগড়ী নষ্ট না হয়ে যায়। কিন্তু তথাপি এই কাপড়টি ময়লা হত না। মোল্লা আলী ক্বারী (রহঃ) লিখেন, তাঁর কাপড়ে উকুন পড়ত না কখনো। কখনো উরুশ তাঁর রক্ত চুষতে পারত না। আল্লামা রাযী (রহঃ) বর্ণনা করেন, প্রিয় নবীজি (সা.)-এর দেহ মোবারকে কখনো মাছি বসে নাই। (খাসায়েলে নববী ১০০ পৃষ্ঠা)

প্রিয় নবীজি (সা.)-এর চামড়ার মোজা মোবারক ঃ

প্রিয় নবীজি (সা.) চামড়ার মোজা পরিধান করতেন এবং এগুলির উপর মাসাহও করতেন। হযরত বুরাইদা (রাযি.) বলেন, হাবশার বাদশাহ নাজ্জাশী প্রিয় নবীজি (সা.)কে কালো রঙ্গের দু'টি পরিস্কার মোজা উপঢৌকন হিসেবে পাঠিয়েছিলেন। রাসূল (সা.) এগুলি ব্যবহার করেছেন এবং ওযূর পর এগুলির উপর মাসাহও করেছেন। (শামায়েলে তিরমিযী)

হযরত মুগীরা ইবনে শো'বা (রাযি.) বলেন, দাহিয়া ক্বালবী (রাযি.) রাসূল (সা.)কে দু'টি মোজা উপহার দিয়েছিলেন। নবীজি (সা.) এগুলি ব্যবহার করতে করতে শেষ পর্যন্ত ফেটে গিয়েছিল। (শামায়েলে তিরমিযী)

মোজা পরিধানের আদব হল, প্রথমে ডান পায়ে পরিধান করবে এরপর বাম পায়ে। মোজা পরিধানের এটাও একটা আদব যে, পরিধান করার পূর্বে মোজা ঝেড়ে নিবে। এর কারণ তিবরানী শরীফে ইবনে আব্বাস (রাযি.) হতে এই মু'জিযার বিবরণ পাওয়া যায় যে, রাসূল (সা.) একদিন জঙ্গলে একটি মোজা পরিধান করত: যখন অন্যটি পরিধান করার ইচ্ছা করছিলেন, তৎক্ষণাৎ একটি কাক কোথা হতে উড়ে এসে ঐ মোজাটি নিয়ে গেল। অত:পর এটাকে উপর হতে নিচে ফেলে দিল। এর মধ্যে একটি বিষধর স্বর্প ঢুকে বসেছিল, সেটা উপর থেকে নিচে পড়ার আঘাতে বেরিয়ে পড়ল। প্রিয়নবীজি (সা.) মহান প্রভুর শোকরিয়া আদায় করলেন এবং উম্মতের জন্য এই বিধান জারী করে দিলেন যে, প্রত্যেক মুসলমানের জন্য জরুরী হল যখন মোজা পরিধান করতে যাবে, তখন তা ঝেড়ে নিবে। (খাসায়েলে নববী ৬০ পৃষ্ঠা)

অর্থাৎ নিচে সেন্ডেলের তলার মত চামড়া হত। এর উপর দু'টি ফিতা লাগানো ছিল। একটি বৃদ্ধাঙ্গুলী ও তার পার্শ আঙ্গুল-এর (মাঝে) মধ্যবর্তী স্থানে। অন্যটি মাঝের আঙ্গুল ও তার পার্শ্ববর্তী আঙ্গুলের মাঝে। আর উভয় ফিতা (পাদুকার) পৃষ্ঠে হত। এই উভয় ফিতা-এর সাথে মিলে থাকত, যা সামনের নকশায় বুঝে আসবে।
আরবে অধিকাংশ চামড়ার পশম উঠানো ছাড়াই পাদুকা বানানো হত। কিন্তু রাসূল (সা.) চামড়া হতে পশম পরিস্কার করে পাদুকা ব্যবহার করতেন, যা সামনের বর্ণনা দ্বারা প্রমাণিত।
হযরত আবীদ ইবনে জারিজ ইবনে ওমর (রাযি.)-এর নিকট জানতে চাইলেন আপনি পশমহীন জুতা ব্যবহার করেন এর কারণ কী? ইবনে ওমর (রাযি.) বলেন, আমি প্রিয় নবী (সা.)-এর এমন জুতাই পরিধান করতে দেখেছি। এটাই আমার পছন্দ।
(শামায়েলে তিরমিযী)
জুতা পরিধান করার আদব হল, ডান পায়ে আগে পরবে এরপর বাম পায়ে। হযরত আবু হুরাইরা (রাযি.) বর্ণনা করেন, নবী আকরাম (সা.) বলেন, তোমাদের মধ্য হতে যে কেউ জুতা পরিধান করবে, সে যেন ডান পা হতে আরম্ভ করে। অর্থাৎ ডান পায়ে আগে জুতা পরিধান করবে। খুলতে গিয়ে বাম পা আগে খুলবে।
(বুখারী ২য় খন্ড, ৮৭০ পৃষ্ঠা, শামায়েলে তিরমিযী)
এটা কেবল জুতার ক্ষেত্রেই নির্দিষ্ট নয়, বরং প্রত্যেক এমন পরিধেয়, যা শোভা বর্ধায়ক, তা পরিধান করার ক্ষেত্রে ডান দিককে প্রাধান্য দেওয়া উচিত। এমনিভাবে এক জুতা পরিধান করে চলতেও রাসূল (সা.) নিষেধ করেছেন। যেমনটা হযরত আবু হুরাইরা (রাযি.) বর্ণনা করেন যে, রাসূল (সা.) বলেন, এক জুতা পরিধান করে কেউ যেন না চলে। হয়ত উভয় জুতা পরিধান করে চলবে, আর না হয় উভয়টা খুলে ফেলবে। (বুখারী ২য় খন্ড, ৮৭০ পৃষ্ঠা, মুসলিম, ২য় খন্ড, ১৯৭ পৃষ্ঠা)
রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর পবিত্র অভ্যাস ছিল না এক জুতা পরিধান করা। এই জন্য তিনি অন্যদেরকে যেহেতু এক জুতা পরিধান করতে নিষেধ করতেন, তাহলে তিনি নিজেই কেন এমনটা করতে যাবেন। আর বাহ্যত: এই হাদীসে এই নিষেধাজ্ঞার দ্বারা উদ্দেশ্য হল অভ্যাসগতভাবে এমনটা করা (এক জুতা পরিধান করা), তবে যদি কেউ অপারগ হয়ে এমনটা করে, তাহলে কোন সমস্যা নেই। যেমন জুতা ছিড়ে গেলে বা অন্য কোন সমস্যা দেখা দিল, তাহলে ভিন্ন কথা। মোটকথা, অভ্যাস ও ভদ্রতা অনুযায়ী প্রতিটি পরিধেয় বস্ত্র পরিধান করা উচিত। অভ্যাস পরিহার করা উচিত।
(খাসায়েলে নববী ৬৪ পৃষ্ঠা)

রাসূল (সা.)-এর জুতা মোবারকের পরিমাপ ঃ
রাসূল (সা.)-এর জুতা মোবারক অর্ধ হাত এবং দুই আঙ্গুল লম্বা ছিল এবং সাত আঙ্গুল প্রশস্ত ছিল । নিচ থেকে দুই ফিতার মধ্যবর্তী দূরত্ব ছিল দুই আঙ্গুল পরিমাণ । (উসওয়ায়ে রাসূল. ১২৬ পৃষ্ঠা)
জুতা মোবারকের নকশা

জ্ঞাতব্য ঃ এই নকশা মোবারক অত্যন্ত আদব ও সম্মানের সাথে রাখতে হবে । তবে বাড়াবাড়ী যেন না হয়ে যায় এবং শরীয়ত পরীপন্থী কোন কাজ না হওয়া চাই । এটাকে কেবল বরকত, ওসীলা ও মহাব্বত স্বরূপ মনে করবে । শরীয়তের বিধি বিধান পরিহার করতঃ কেবল এটাকে আঁকড়ে ধরে রাখা, এমনটি যেন না হয় । (আল্লামা থানভী (রহঃ) কর্তৃক প্রণীত যাদুস সায়ীদ) । কবি মুযতার বিষয়টাকে এভাবে তুলে ধরেছেন ঃ

تھی چپل کیطرح کی ساخت نعلین معلّٰی کی ☆ زباں کی شکل کی ہیئت تھی جو چرم مصطفٰی کی

সেন্ডলের ন্যায় জুতা ছিল প্রিয় নবীজির
জিভ সদৃশ্য চামড়ার জুতা ছিল নবীজির ।

تلہ دوہرا تھا اور دوہرے تھے تسمے دوجگہ اسمیں ☆ لگیں تھیں پشت پا پر بیچ میں دو پٹیاں جسمیں

তলা দু পাই ছিল, জায়গা ছিল ফিতা লাগানোর এই স্থানে
পদপৃষ্ঠে লাগানো ছিল পট্টি দু'টো মাঝখানে ।

وہ تسمے ڈال لیتے انگلیوں میں اپنی پیغمبر☆انگوٹھے کے بھی پاس ایک بیچ کی انگلی کے بھی اندر

সেই ফিতাটা লাগিয়ে নিতেন স্বীয় আঙ্গুলে পয়গাম্বর
বৃদ্ধাঙ্গুলী ও এর পার্শ্বে ছিল যে আঙ্গুল এর ভিতর ।

জুতা মোবারকের বরকত ঃ

হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানভী (রহঃ) যাদুস সায়ীদ কিতাবে মুহাম্মদ আল-জাযিরী (রহঃ) হতে বর্ণনা করেন যে, যে ব্যক্তি উক্ত জুতা মোবারকের নকশা নিজের কাছে রাখবে, সমস্ত সৃষ্টি কুলের মাঝে সে সম্মানিত থাকবে । আর স্বপ্নযোগে রাসূল (সা.)কে দেখার সৌভাগ্য নসীব হবে । যে কাফেলায় এই নকশা থাকবে, তা লুটতরাজ থেকে মুক্ত ও নিরাপদ থাকবে । এমনিভাবে হাফেজ আলসামানী হতে অনেক বরকতের কথা উল্লেখ করা হয়েছে । তন্মধ্যে এটাও একটা বর্ণিত হয়েছে যে, যে ব্যক্তি এই নকশাকে বরকতের জন্য নিজের কাছে রাখবে, সে ব্যক্তি জালিমের জুলুম হতে নিরাপদে থাকবে এবং দুশমনের দুশমনী হতে, শয়তানের শয়তানী হতে, হিংসুকের হিংসা হতে নিরাপদ থাকবে । আর যদি এই নকশাকে কোন গর্ভবতী মহিলা প্রসবের প্রচন্ড ব্যাথার সময় ডান হাতে বেঁধে রাখে, তাহলে আল্লাহর মেহেরবানীতে তার সমস্যা সমাধান হয়ে যাবে । মোটকথা, যে যে নিয়তে এটাকে ওসীলা বানিয়ে আল্লাহর নিকট সাহায্য প্রার্থনা করবে, এর বরকতে আল্লাহ তা'আলা তা পূরণ করবেন । (যাদুস সায়ীদ)

রাসূল (সা.)-এর বিছানা মোবারক ঃ

বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর বিছানা মোবারক কখনো (ছালার) চট হত, কখনো চাটাই হত, কখনো চামড়া হত, যাতে খেজুরের ছাল ভরা থাকত ।

হযরত আয়েশা (রাযি.) বলেন, প্রিয় নবীজি (সা.)-এর শয্যার বিছানা চামড়ার হত, যার মধ্যে খেজুর গাছের বাকল ভরে দেওয়া হত ।

(বুখারী ২য় খন্ড, ৯৫৬ পৃষ্ঠা/মুসলিম ২য় খন্ড, ১৯৪ পৃষ্ঠা/ শামায়েলে তিরমিযী)

হযরত হাফসা (রাযি.)-এর নিকট জানতে চাওয়া হল যে, নবীজির শয্যা কেমন ছিল? প্রতিউত্তরে তিনি বললেন, একটা চট ছিল, যেটা দু ভাজ করে আমরা নবীজির নিচে বিছিয়ে দিতাম । একদিন আমার মনে হল, এটাকে যদি চার ভাজ করে বিছিয়ে দেওয়া যায়, তাহলে আরো অধিক নরম হবে । তো আমি এটাকে চার ভাজ করে বিছিয়ে দিলাম । তখন নবী (সা.) সকালে জিজ্ঞেস করলেন, আমার নিচে কী বিছানো হয়েছিল? বলা হল, প্রতিদিন যা বিছানো হয়, আজ তাই

বিছানো হয়েছে, তবে আজকে এটাকে চার ভাজ করে বিছানো হয়েছে, যাতে আরেকটু নরম হয়। তখন হুজুর (সা.) বললেন, এটাকে আগের অবস্থায়ই থাকতে দাও। কারণ এটা নরম ও আরামদায়ক হওয়ায় রাতে তাহাজ্জুদের সময় উঠতে কষ্ট হয়। (শামায়েলে তিরমিযী)

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসঊদ (রাযি.) বলেন, একবার আমি নবীজির খেদমতে উপস্থিত হলাম। তিনি চাটাইয়ে শুয়ে আরাম করছিলেন। দেহ মোবারকে এর দাগ ফুটে উঠল। আমি তা দেখে কাঁদতে লাগলাম। নবীজি (সা.) জিজ্ঞেস করলেন, কী ব্যাপার কাদছ কেন? আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! রোম, পারস্যের সম্রাটরাতো মখমল, রেশমের গদির উপর শুয়ে আরাম করে থাকে। আর আপনি কিনা এই চাটাইয়ে ঘুমান। রাসূল (সা.) উত্তরে বললেন, এটা কান্নার কোন কারণ হল? আরে এদের জন্যতো কেবল দুনিয়াতেই ভোগ-বিলাসের সকল উপকরণ আর আমাদেরকে আল্লাহ তা'আলা পরকালে এর চেয়ে অনেক অনেক বেশী দিবেন।

(খাসায়েলে নববী ২৭৯ পৃষ্ঠা)

এমন আরেকটি ঘটনা হযরত ওমর (রাযি.)-এর ক্ষেত্রে ঘটেছিল। তিনি প্রিয়নবীজির খেদমতে হাজির হলেন আর এমনই প্রশ্নোত্তর নবীর সাথে হয়েছিল। এর বিস্তারিত বিবরণ বুখারী শরীফ ২য় খন্ড ৭৮২ পৃষ্ঠায় রয়েছে।

অসংখ্য হাদীসে উল্লেখ রয়েছে যে, সাহাবাগণ যখন নরম বিছানা বানানোর অনুরোধ করতেন, তখন দয়ার নবী এই বলতেন যে, আমি পার্থিব আরাম ও সুখ দিয়ে কী করব? আমার উদাহরণতো সেই পথচলা পথিকের ন্যায়, যে পথ চলতে চলতে রাস্তার পার্শ্বে কোন বৃক্ষের ছায়ায় একটুখানি আরাম করে আবার পথ চলতে শুরু করে। (খাসায়েলে নববী ২৭৮ পৃষ্ঠা)

এই ছিল আমাদের নেতা নবী মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (সা.)–এর জীবনাবস্থা, যা শুনে প্রতিটা উম্মতের মন ভরে যায়। আর তাঁর উম্মতের শয্যায় গালিচার যে বাহার! তাতো আমাদের চোখের সামনেই।

হযরত আয়েশা (রাযি.) বলেন, আমাদের ঘরে এক আনসারী মহিলা এল, সে নবীজির বিছানা দেখল যে, সেখানে একটি আবা (আলখেল্লা) বিছানো রয়েছে। সে তার ঘরে গিয়ে নবীর জন্য একটি বিছানা বানিয়ে আনল, যা পশমে ভরা ছিল। এরপর এটাকে নবীজির জন্য আমার নিকট পাঠানো হল। নবীজি (সা.) আমার গৃহে প্রবেশ করতঃ সেটা দেখে জানতে চাইলেন এটা কি? আমি ঘটনা বৃত্তান্ত বর্ণনা করলাম। রাসূল (সা.) বললেন, এটা ফিরিয়ে দাও। হযরত আয়েশা (রাযি.) বলেন, সেটা এতই চমৎকার ছিল যে, তা ফেরত দিতে মন চাইছিল না। কিন্তু

নবীজি (সা.) তাকিদ দিয়ে বললেন, আল্লাহর শপথ! আমি যদি চাই তো আল্লাহ তা'আলা সোনা রূপার পাহাড় আমার জন্য চলমান করে দেবেন। নবীজি (সা.) এ কথা বলার পর সেটা ফেরত দিয়ে দিলাম। (খাসায়েলে নববী ২৭৮ পৃষ্ঠা) كان ينام احيانا على سرير تومول بشريط حتى يوثر فى جنبه
হযরত হাফসা (রাযি.) বলেন, তিনি খেজুর বৃক্ষের ফালে বানানো চৌকিতে আরাম করতেন। এমনকি তাঁর দেহ মোবারকে দাগ পরে যেত।
কবি মুযতার সাহেবের ছন্দময় উপস্থাপনা ঃ

تھا بستر ٹاٹ کا اور کھر دری سی چار پائی تھی ☆ لگائی جس میں ہوتی چھال کی رسی کھجوروں کی

ছালার চটের বিছানা ছিল উঁচু নিচু চৌকি
খেজুর গাছের ছাল দ্বারা তৈরী হত যে চৌকি।

کبھی ارام فرما اس پہ جب ہوتے تھے پیغمبر ☆ نشانات اس کے پڑ جاتے تھے پہلوئے مبارک پر

সেই চৌকিতে নবীজি যখন ঘুমুতেন আরাম করে
শক্ত রশির দাগ পড়ত পবিত্র দেহের পরে।

নবীজির (সা.) বালিশ মোবারক ঃ
হযরত আয়েশা (রাযি.) বর্ণনা করেন, তিনি যে বালিশে হেলান দিতেন, সেটা চামড়ার ছিল, যার ভিতর খেজুর বৃক্ষের ছাল ভরা ছিল। (মুসলিম শরীফ ১৯৪/২)
হযরত জাবের ইবনে সামুরা (রাযি.) বলেন, আমি তাঁকে একটি বালিশে হেলান দেয়া অবস্থায় দেখলাম। (শামায়েলে তিরমিযী)
যাদুল মা'আদ গ্রন্থে আছে, নবীজি (সা.) একটি বালিশে হেলান দিতেন আবার কখনো মুখমন্ডলের নিচে হাত রেখে দিতেন। (উসওয়ায়ে রাসূল সা.)
হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রাযি.) বলেন, রাসূল (সা.) আমাদের ঘরে আগমন করলেন। আমি তাঁর জন্য চামড়ার বানানো একটি বালিশ দিলাম, যার ভিতরে খেজুরের ছাল ভর্তি ছিল। (বুখারী ৯২৮/২)
প্রিয়নবীজির (সা.) সুগন্ধি ঃ
মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (সা.) সুগন্ধিযুক্ত বস্ত্র অত্যন্ত পছন্দ করতেন এবং খুব বেশী ব্যবহার করতেন। অন্যদেরকেও এর প্রতি উদ্বুদ্ধ করতেন। (নশরুত্তীব)
হযরত আনাস (রাযি.) বলেন, নবী কারীম (সা.)-এর নিকট একটি আতরের শিশি ছিল। এর থেকে সুগন্ধি ব্যবহার করতেন। (শামায়েলে তিরমিযী)

হযরত আয়েশা (রাযি.) বলেন, আমি রাসূল (সা.)কে সবচেয়ে উত্তম সুগন্ধি লাগিয়ে দিতাম আর এই সুগন্ধির চমক আমি তাঁর দাড়ী ও মাথা মোবারকে দেখতে পেতাম।
(বুখারী ৮৭৭/২)
যাদুল মা'আদ গ্রন্থে সহীহ হাদীস দ্বারা বর্ণিত আছে যে, রাসূল (সা.) বলেছেন, সুগন্ধির বৈশিষ্ট্যতা এই যে, ফেরেশতাগণ সুগন্ধি ব্যবহার করাকে ভালবাসেন। আর শয়তান একে অপছন্দ করে। শয়তানের জন্য সবচেয়ে পছন্দের ব্যক্তি হল, যে নোংরা দুর্গন্ধযুক্ত থাকে। তাই পূতপবিত্র আত্মা যাদের, তারা সুগন্ধিকেই পছন্দ করেন। আর নোংরা আত্মা যাদের, তাদের কাছে নোংরামীটাই পছন্দনীয় হয়ে থাকে। প্রত্যেক আত্মা তার পছন্দের বিষয়ের দিকেই ধাবিত হয়ে থাকে। (উসওয়ায়ে রাসূল)
শুধু এই কারণেই রাসূল (সা.) সুগন্ধি ব্যবহার করতেন। অন্যথায় কোন সুগন্ধি ব্যবহার ছাড়াই প্রিয় নবীজির (সা.)-এর দেহ মোবারক থেকে মেশকে আম্বর হতেও বেশী সুঘ্রাণ আসতে থাকত।
হযরত জাবের (রাযি.) হতে বর্ণিত আছে, যে গলিপথ দিয়ে রাসূল (সা.)-এর গমন হত, সে পথ দ্বারা পরবর্তী কেউ অতিক্রম করলে উক্ত গলিপথটা সুঘ্রাণে মুখরিত দেখে বুঝা যেত যে, এই পথ ধরে প্রিয়নবী (সা.)-এর গমনাগমন হয়েছে।
(মেশকাত ৫১৭/২)
একবার রাসূল (সা.) স্বীয় হস্ত মোবারকে ফুঁক দিয়ে হযরত উকবা (রাযি.)-এর কোমরে হাতখানা মুছে দিলেন। এর দ্বারা এত চমৎকার সুঘ্রাণ তাঁর পিঠ থেকে ছড়াতে লাগল যে, তাঁর চারজন স্ত্রী ছিল, প্রত্যেকেই প্রচুর পরিমাণ সুগন্ধি ব্যবহার করে উকবার (রাযি.) সমান হতে চাইত, কিন্তু তারপরও উকবার সুঘ্রাণই প্রাধান্য পেত।
(খাসায়েলে নববী)
এমনিভাবে বিশ্বনবী মোস্তফা (সা.)-এর ঘাম থেকে অধিক সুগন্ধি আর কিছুই ছিল না।
হযরত আনাস (রাযি.) বলেন, আমি জীবনে কোন আতর বা মেশককে নবীজির ঘামের সুঘ্রাণ থেকে অধিক স্রঘ্রাণযুক্ত শুঁকি নাই। (বুখারী ৫০৩/২)
হযরত আনাস (রাযি.) বলেন, রাসূল (সা.) আমাদের গৃহে আরাম করছিলেন এবং তাঁর পবিত্র দেহ থেকে ঘাম বের হচ্ছিল। আমার মাতা এই ঘাম একটি শিশিতে জমা করতে লাগলেন। ইতিমধ্যে রাসূল (সা.)-এর ঘুম ভেঙ্গে গেল। তিনি ঘাম জমা করার কারণ জানতে চাইলে সেই মহিয়ষী রমনী বললেন যে, এই ঘামকে আমি অন্য সুগন্ধির সাথে মিলাব। এই ঘাম অন্য সকল সুঘ্রাণ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ সুঘ্রাণ।

রাসূল (সা.)-এর নিকট হাদিয়া হিসেবে কোন সুগন্ধি দেয়া হলে, তিনি অবশ্যই তা গ্রহণ করতেন। সুগন্ধিযুক্ত বস্তু ফিরিয়ে দেয়া নবীজির অভ্যাসের পরিপন্থী ছিল।
(বুখারী ৮৭৮/২)
সুগন্ধিকে তিনি মাথায়ও ব্যবহার করতেন। আর যখন ঘুম থেকে জাগ্রত হতেন, তখন প্রাকৃতিক প্রয়োজন সম্পন্ন করে ওযূ করে তারপর পরিধেয় বস্ত্রতে সুগন্ধি ব্যবহার করতেন। সুগন্ধি ব্যবহার করার ক্ষেত্রে তাঁর পছন্দের তালিকায় শীর্ষে ছিল মেশক, উদ (আগর কাষ্ঠ) রায়হান, (অধিক সুগন্ধযুক্ত কাঠ)।
(উসওয়ায়ে রাসূল ১২৭)
এই বিষয়টার অনন্য উপস্থাপনা কবি মুযতার-এর ছন্দে ঃ

کسی کوچے سے ہوتا جب گذر محبوب باری کا ☆ تو چلتا کارواں اک نکہت باد بہاری کا
فضاء ساری مہک جاتی تھی وہ جس راہ جانے سے ☆ نکلتے جستجو میں جو وہ خوشبو سے پتہ پاتے

پسینہ پونچھ کرر کھتے صحابہ جسم اطہر کا ☆ خوشبو میں گلاب ومشک وعنبر سے بھی بہتر تھا

مصافح جسکو ہونے کی سعادت ہاتھ آتی تھی ☆ تو پورا دن گذر جاتا مگر خوشبو نہ جاتی تھی

کسی بچے کے سر پر دست رحمت پھیر گردیتے ☆ تو سب بچوں میں خوشبو سے اسے ممتاز کردیتے

যখন কোন গলিতে হত খোদার হাবিবের শুভাগমন,
ছড়িয়ে যেত সুরভী তাঁর মুহিত হত সবার মন।

পবিত্র দেহের ঘাম মুছে নিতেন তাঁর প্রিয় সাহাবাগণ,
মেশক আম্বর, গোলাপ হতেও তাঁর সৌরভ ছিল বহুগুণ।

মুসাফাহার সৌভাগ্য যদি হয়ে যেত কারো তাঁর সাথে,
খুশবু ছড়াত সারা দিন ব্যাপী মুসাফাহাকারীর হাত হতে।

কোন শিশুর মাথা কভু বুলিয়ে দিতেন যদি দরদী হাতে,
স্বীয় মহিমায় উজ্জল হ ত সে প্রিয় নবীজির বরকতে।
রাসূল (সা.)-এর আংটি মোবারক ঃ
হযরত আনাস (রাযি.) বলেন, প্রিয় নবী (সা.)-এর আংটি, পাথরসহ পুরাটাই রূপার ছিল। আর তাঁর পাথরটি আফ্রিকান মডেলে বানানো ছিল।
(বুখারী ৮৭২/২, মুসলিম ১৯৭/২)
হযরত আনাস (রাযি.) বলেন, মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (সা.) যখন অনারব বাদশাদের নিকট পত্র প্রেরণ করার ইচ্ছা পোষণ করলেন, তখন লোকেরা বলল,

অনারব রাজা বাদশাহরা মোহর ব্যতীত কোন পত্র গ্রহণ করে না। তাই নবী করীম (সা.) একটি আংটি বানালেন, যার শুভ্রতা যেন আমার চোখের সামনে ভাসমান। (বুখারী ৮৭৩/২, মুসলিম ১৯৭/২) সাদা বর্ণ হওয়ার দ্বারা ব্যাপারটি রূপার আংটি হওয়ার প্রমাণ বহন করে।

রাসূল (সা.) যখন হুদাইবিয়ার সন্ধির পর মদিনায় প্রত্যাবর্তন করলেন, তখন তিনি বিভিন্ন রাজা বাদশাহকে পত্রের মাধ্যমে ইসলামের দিকে আহ্বান করতে লাগলেন। আর দক্ষ ও বিচক্ষণ সাহাবাগণকে এই কাজের জন্য দূত হিসেবে মনোনীত করলেন। এবং তাঁদেরকে পত্রসহ বিভিন্ন বাদশাদের নিকট প্রেরণ করলেন। নিম্নে তাঁদের নাম ও তাঁদের পত্রবাহক সাহাবাগণের নাম সবিস্তারে দেওয়া হল ঃ

প্রাপক রাজা বাদশাহগণের নাম

১। হাবশার বাদশাহ নাজ্জাশী, যার আসল নাম আছহামা।
২। মিশরের বাদশাহ মাকুকাশ, যার মূল নাম ছিল জারিজ ইবনে মাতা।
৩। পারস্য সম্রাট কিসরা, যার মূল নাম ছিল খসরু পারভেজ।
৪। রোম সম্রাট কায়সার, যার মূল নাম ছিল হিরাক্লিয়াস।
৫। বাহরাইনের হাকেম মুনজির ইবনে সাবী।
৬। ইয়ামামার হাকেম হাওজা বিন আলী

৭। দামেশকের বাদশা হারেছ ইবনে আবি শিফার গাছ্ছানী।
৮। ইয়ামামার বাদশাহ হায়কার ও তার ভাই আবদে পেছরান জালান্দি।

পত্র বাহক সাহাবাগণের নাম

১। আমর ইবনে উমাইয়া জমিরী (রাযি.)
২। হাতেব ইবনে আবি বালতা'আ (রাযি.)
৩। আবদুল্লাহ বিন হুযাফা ছাহমী (রাযি.)
৪। দাহইয়া কালবী (রাযি.)

৫। আলা ইবনে খাজরামী (রাযি.)

৬। ছালিত ইবনে আমর আমেরী (রাযি.)
৭। সজায় ইবনে ওয়াহহাব (রাযি.)

৮। আমর ইবনুল আস (রাযি.)

এসব পত্র মারফত বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (সা.) সত্যের পয়গাম পৃথিবীর বিভিন্ন বাদশাহগণের নিকট পৌঁছিয়েছেন। এর জবাবে কেউ ঈমান এনেছে, আর কেউ কুফরীর অন্ধকারে নিমজ্জিত থেকে গেছে। কিন্তু যারা কুফরীতে রয়ে

বাদশাহ্ নাজ্জাশীর নিকট প্রেরিত রাসূল (সা.)-এর ঐতিহাসিক পত্র

এই পত্রটি রাসূল (সা.) আংটি (সিল মোহর) বানানোর পূর্বে লিখেছিলেন, তাই এটা মোহরাংকিত নয়।
অনুবাদ ঃ
বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম! মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর পক্ষ হতে হাবশার বাদশাহ নাজ্জাশী বরাবর! ইসলাম গ্রহণ করে নাও। আমি তোমাকে সেই আল্লাহর গুনকীর্তন পৌঁছে দিচ্ছি, যিনি ব্যতীত আর কোন উপাস্য নেই। তিনি রাজাধিরাজ। সকল ত্রুটি-বিচ্যুতি হতে পবিত্র। সব ধরনের অপূর্ণতা হতে মুক্ত। নিরাপত্তার বিধায়ক। তত্ত্বাবধানকারী। আমি এই বিশ্বাসের স্বীকৃতি প্রদান করছি যে, হযরত ঈসা ইবনে মরিয়ম আল্লাহ তা'আলার পবিত্র আত্মা ও তাঁর হুকুম। বিশ্ববিধাতা তাঁকে সতী-সাধ্বি মহিয়সী রমণী মরিয়মের নিকট প্রেরণ করলেন। যার দ্বারা তিনি গর্ভধারণ করলেন। তো আল্লাহ তা'আলা ঈসা (আ.)কে তাঁর স্বীয় কুদরত দ্বারা সৃষ্টি করেছেন এবং তাঁর দেহে প্রাণ সঞ্চার করেছেন। যেভাবে তিনি আদম (আঃ)কে নিজ হাতে সৃষ্টি করেছেন। আমি তোমাকে মহামহিম বিশ্বপতির দিকে আহ্বান করছি, যার কোন শরীক নাই। তাঁর আনুগত্যের এবং আমার আনুগত্যের দিকে আর ঐ শরীয়তের দিকে, যা আমি নিয়ে এসেছি। এর উপর ঈমান আন, নিঃসন্দেহে আমি আল্লাহর সত্য রাসূল। আমি তোমাকে ও তোমার সমস্ত বাহিনীকে

আল্লাহর দিকে আহ্বান করছি। আমি আল্লাহর বাণী ও নসীহত করেছি। সুতরাং এবার তুমি আমার এই নসীহত গ্রহণ করে নাও। ঐ ব্যক্তির উপর শান্তি বর্ষিত হোক, যে হেদায়াত গ্রহণ করে।
(আর-রাহীকুল মাখতুম ৫৪৯ পৃষ্ঠা, সীরাতে মুস্তফা ১ পৃষ্ঠা)

মিশরের বাদশাহ মাকুকাশকে দেয়া
রাসূল (সা.)-এর ঐতিহাসিক পত্র
এতে সিল-মোহর স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। (মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ)
অনুবাদ ঃ
বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম
মুহাম্মাদ আল্লাহর বান্দা ও তাঁর রাসূল-এর পক্ষ হতে “মাকুকাশ” কিবতী প্রধান-এর বরাবর পত্র!
ঐ ব্যক্তির উপর সালাম, যে হেদায়াতের অনুসারী। আমি তোমাকে ইসলামের দাওয়াত দিচ্ছি। ইসলাম গ্রহণ করো, শান্তিতে থাকতে পারবে। আল্লাহ তোমাকে ডবল নেয়ামত বিনিময় হিসেবে দান করবেন। আর যদি তুমি তা গ্রহণ না কর, তাহলে কিবতীবাসীদের ইসলাম গ্রহণ না করার সকল গোনাহ তোমার উপর বর্তাবে। হে আহলে কিতাব! এমন সরল পথের দিকে অগ্রসর হও, যা আমাদের ও তোমাদের উভয়ের ক্ষেত্রে সমান। যে আমরা এক আল্লাহ ব্যতীত আর কারো ইবাদত করব না। আর কাউকে তাঁর শরীক করব না। আর একে অপরকে প্রভু নির্ধারণ করব না একমাত্র আল্লাহ ব্যতীত। অত:পর যদি সে মুখ ফিরিয়ে নেয়,

(ইসলাম গ্রহণ না করে), তাহলে তাকে বলে দাও, তুমি সাক্ষী থাক, আমরা মুসলমান ।
(আর-রাহীকুল মাখতুম ৫৫১. সীরাতে মুস্তফা ২)
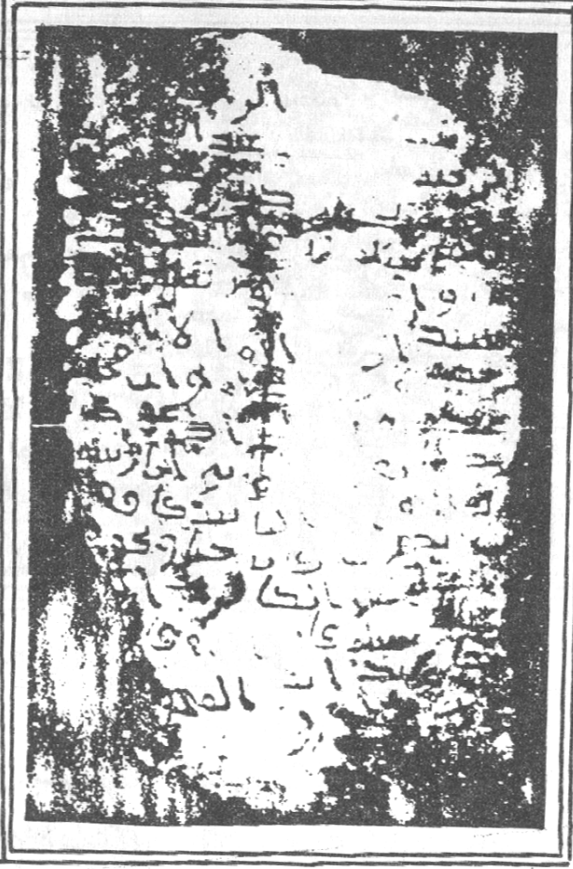
পারস্য সম্রাট খসরু পারভেজের বরাবর
রাসূল (সা.)-এর ঐতিহাসিক পত্র

খসরু পারভেজ এই পত্রখানা পাঠ করে রাগে গোস্বায় অগ্নিশর্মা হয়ে রাসূল (সা.)-এর পত্রখানা ছিড়ে টুকরো টুকরো করে ফেলেছিল এবং দম্ভভরে বলেছিল "আমার প্রজাদের থেকে একটি তুচ্ছ গোলাম তার নাম আমার নামের আগে লেখার স্পর্ধা দেখায়" ।

রাসূল (সা.) যখন এই ঘটনা জানতে পারলেন, তখন এই হতভাগার জন্য বদদোয়া করলেন- "আল্লাহ যেন তার রাজত্বকে এভাবে টুকরো টুকরো করে

দেন।” এর পরিণতি হয়েছিলও তাই। তার ছেলে শিরওয়াই তাকে নির্মমভাবে হত্যা করে। ইতিহাসের কিতাবে ঘটনার পূর্ণ বৃত্তান্ত উল্লেখ রয়েছে। এরপর তার সাম্রাজ্যটাই বিলুপ্ত হয়ে গেল। (আর-রাহীকুল মাখতুম, আসা. সিয়ার. সীরাতে মুস্তফা)
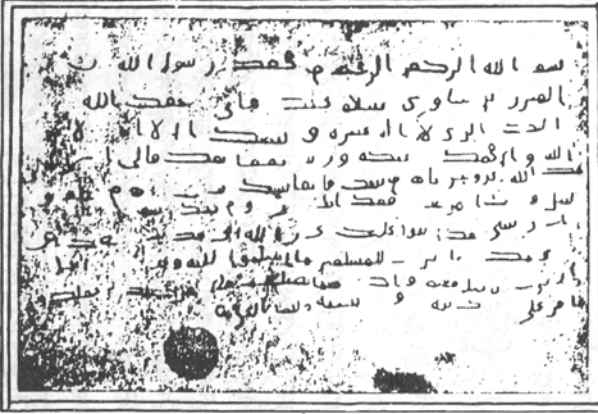
বাহরাইনের শাসক মুনজির ইবনে সাবী-এর নামে
রাসূল (সা.)-এর ঐতিহাসিক পত্র

রাসূল (সা.) মুনজিরের নিকট এই পত্র পাঠালেন। মুনজির তা পাঠ করে ইসলাম গ্রহণ করে নিয়েছিল এবং সে নবীজি (সা.)কে প্রতিউত্তরে লিখেছিল, “হে আল্লাহর রাসূল! আমি আপনার পত্রখানা বাহরাইনের জনসাধারণকে পাঠ করে শুনিয়ে দিয়েছি। এদের মধ্যে কেউ কেউ ইসলামের সুশীতল ছায়াতলে আশ্রয় গ্রহণ করেছে। আর কেউ কেউ করে নাই। আর আমার রাজ্যে ইয়াহুদী, অগ্নিপুজকও বাস করে। তাদের ব্যাপারে আমার করনীয় কি, তা অনুগ্রহ করে জানাবেন।
রাসূল (সা.) এই পত্রের উত্তর এভাবে লিখালেন, যার ফটোকপি আমাদের সামনে দৃশ্যমান। আরো বেশি জানার আগ্রহ থাকলে অধ্যয়ন করুন “আর রহীকুল মাখতুম ৫৪৭ পৃষ্ঠা, আসাহ্হুর সিয়ার ৩৮৯ পৃষ্ঠা, সীরাতুল মোস্তফা ২য় খন্ড।
রাসূল (সা.)-এর আংটিতে কী লিখা ছিল?
হযরত আনাস (রাযি.) বলেন, রাসূল (সা.)-এর আংটি মোবারকে “মুহাম্মাদুর রাসূল্লাহ” লিখা ছিল। এভাবে যে, এক লাইনে “মুহাম্মদ” আরেক লাইনে “রাসূল” আরেক লাইনে “আল্লাহ”।
(বুখারী ৮৭৩/২)
আল্লামা নববী (রহঃ) বলেন, এই হাদীস দ্বারা এই মাসআলা বের হয় যে, আংটিতে নিজের নাম, আল্লাহর নাম, অথবা অন্য কোন বিজ্ঞ বচন লিখা জায়েয আছে। (নববী, মুসলিম ১৯৬/২) কিন্তু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ লিখানো নিষেধ। যা

নবী (সা.)-এর বাণী বুখারী শরীফের উদ্ধৃতিতে এভাবে এসেছে। নবী (সা.) বলেন, আমি রূপার আংটিতে মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ লিখেছি। সুতরাং কেউ যেন আমার আংটির নকশার মত কোন আংটি না বানায়। (বুখারী শরীফ ৮৭৩/২)

আল্লামা শামী (রহঃ) বলেন, "মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ" ছাড়া অন্য যে কোন বাক্য আংটিতে অংকন করা জায়েয আছে। কেননা, আবু বকর (রাযি.)-এর আংটিতে এই বাক্য লিখা ছিল যে, "নিয়মাল ক্বাদীরু আল্লাহ"। হযরত ওমর ফারুক (রাযি.)-এর আংটিতে এই বাক্য লিখা ছিল যে, "কাফা বিল মাওতে ওয়াইজান"। হযরত ওসমান (রাযি.)-এর আংটির নকশা ছিল "লা তাসবিরান্না আও লা তানদিমান্না"। হযরত আলী (রাযি.)-এর আংটিতে এই নকশা ছিল যে, "আল মুলকু লিল্লাহ"। হযরত ইমামে আযম আবু হানীফা (রহঃ)-এর আংটিতে নকশা ছিল "কুলিল খায়রা ওয়াইল্লা ফাসকুত"। ইমাম আবু ইউসুফ (রহঃ)-এর আংটিতে এই নকশা ছিল "মান আমিলা বি রা'ইহী ফাকাদ নাদিমা"। ইমাম মুহাম্মদ (রহঃ)-এর আংটিতে এই নকশা ছিল "মান সাবারা জাফারা"। (শামী, লেবাননে মুদ্রিদ ২৩০ পৃষ্ঠা)

এমনিভাবে মাওলানা আশরাফ আলী থানভী (রহঃ)-এর আংটিতে এই নকশা "আয গুরুহে আওলিয়া আশরাফ আলী"। হযরত মাওলানা রশীদ আহমদ গাঙ্গুহী (রহঃ)-এর আংটিতে নকশা ছিল "রশীদ আহমদ"। হযরত শায়খুল হিন্দ (রহঃ)-এর আংটিতে নকশা ছিল "এলাহী আকেবাত মাহমুদ গরদাঁ"।

রাসূল (সা.)-এর আংটি কোন হাতে পরিধান করতেন ঃ

রাসূল (সা.)-এর আংটি ডান বাম উভয় হাতে পরিধান করতেন। কোন নির্দিষ্ট ছিল না। হাদীসেও উভয় হাতে পরিধান করার প্রমাণ পাওয়া যায়। তাই আংটি উভয় হাতেই পরিধান করা জায়েয। হাফেজ আল্লামা ইবনে হাজার আসকালানী (রহঃ) যিনি হাদীস শাস্ত্রের ইমাম ছিলেন। তিনি বলেন, আমি এ ব্যাপারে সকল হাদীস অধ্যায়ন করার ফলে এই কথা আমার বুঝে আসল যে, যদি সৌন্দর্যের জন্য পরিধান করতে হয়, তাহলে ডান হাতে, আর যদি মোহর লাগানোর উদ্দেশ্যে পরিধান করতে হয়, তাহলে বাম হাতে পরিধান করা উত্তম, যাতে ডান হাত হতে খুলে মোহর মারতে সহজ হয়।
(খাসায়েয়ে নববী ৮১)

রাসূল (সা.)-এর আংটি কোন আঙ্গুলে পরিধান করতেন ঃ

হযরত আনাস (রাযি.) বাম হাতের ছোট আঙ্গুলের ইঙ্গিত করে বলেন, রাসূল (সা.) এই আঙ্গুলে আংটি ব্যবহার করতেন। আরেকটি হাদীস, যা হযরত আনাস (রাযি.) বর্ণনা করেন যে, রাসূল (সা.) আংটি বানালেন আর বললেন, আমি আংটি

বানিয়েছি আর এতে নকশা করে দিয়েছি। সুতরাং এই বাক্যটা আর কেউ যেন নকশা না করে। যাতে নবীজির (সা.) আংটি সবার থেকে আলাদা থাকে। হযরত আনাস (রাযি.) বলেন, আমি যেন রাসূলের বাম হাতের ছোট আঙ্গুলে আংটির ঝলক এখনো অনুভব করছি। আর একই সাথে দুই আঙ্গুলে আংটি ব্যবহার করতে রাসূল (সা.) নিষেধ করেছেন। (বুখারী ৮৭৩/২)

হযরত আলী (রাযি.) বলেন, রাসূল (সা.) আমাকে মধ্যমা ও শাহাদাত আঙ্গুলে আংটি ব্যবহার করতে নিষেধ করেছেন। (মুসলিম ১৯৭/২)

এই জন্য এই দুই আঙ্গুলে আংটি ব্যবহার করা মাকরূহ। এই হাদীসের ভিত্তিতে আল্লামা নববী (রহঃ) বলেন, তা মকরূহে তানযীহী হবে। প্রকৃত সুন্নত হল ছোট আঙ্গুলে পরিধান করা। আল্লামা নববীর মতে এটা সর্বসম্মতিক্রমে সুন্নত। (শামায়েলে তিরমিযী, নববী ১৯৭) আল্লামা শামীও তাঁর সাথে একমত পোষণ করেছেন। (শামী ২৩০/৫)

রাসূল (সা.)-এর আংটির পাথর কোন দিকে রাখতেন ঃ

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসঊদ (রাযি.) বর্ণনা করেন, রাসূল (সা.) আংটির পাথর নিচের দিকে (মুষ্টির) ফিরিয়ে রাখতেন। (বুখারী ৮৭৩/২)

হযরত আনাস (রাযি.) বলেন, রাসূল (সা.) আংটির পাথর মুষ্টির দিকে ফিরিয়ে রাখতেন।
(মুসলিম ১১৭/২)

শামায়েলে তিরমিযীসহ অধিকাংশ কিতাবের বর্ণনা মতে এটাই সহীহ বলে প্রতিয়মান হয়। এতে অহংকার থেকে বাঁচা যায়, আর পাথরটাও হেফাযত থাকে।

আলেমগণ বলেন, পাথরকে মুষ্ঠির দিকে রাখা অথবা পৃষ্ঠের দিকে রাখা উভয়টাই জায়েয আছে। তবে রাসূলের অনুসরণ করতঃ মুষ্ঠির দিকে রাখাটাই উত্তম।
(শরহে মুসলিম ১৯৬/২)

আল্লামা শামী (রহঃ) বলেন, পুরুষরা আংটির পাথর মুষ্ঠির দিকে আর নারীরা উপর দিকে রাখা উত্তম। যেহেতু নারীদের ব্যবহার সৌন্দর্যের জন্য আর সৌন্দর্য উপরের দিকে ভাল দেখায়।
(শামী ২৩০/৫)

নবীজির (সা.) স্বর্ণের আংটি ঃ

আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাযি.) বলেন, রাসূল (সা.) স্বর্ণের আংটি বানিয়েছিলেন, এর পাথরটি মুষ্ঠির দিকে ছিল। এতে লিখা ছিল "মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্"। রাসূলের দেখাদেখি সাহাবাগণও স্বর্ণের আংটি বানাতে লাগলেন। রাসূল (সা.) এই অবস্থা দেখে স্বীয় আংটিটি আঙ্গুল থেকে খুলে ছুড়ে ফেলে দিলেন। আর বললেন, এটা আর কোন দিন ব্যবহার করব না। অবস্থাদৃষ্টে সাহাবাগণও যার যার আংটি ছুড়ে

ফেলে দিলেন। এরপর রাসূল (সা.) রূপার আংটি বানালেন।
(বুখারী ৮৭২/২, মুসলিম ১৯৬/২)
ইসলামের প্রথম দিকে পুরুষদের জন্য স্বর্ণ ব্যবহার করা জায়েয ছিল। পরে তা হারাম হয়ে গেছে।
হযরত আবু হুরাইরা (রাযি.) বলেন, রাসূল (সা.) স্বর্ণের আংটি ব্যবহার করতে নিষেধ করেছেন।
(বুখারী ৮৭১/২)
এখন সকল আলেমগণ একমত যে, পুরুষদের জন্য স্বর্ণ ব্যবহার করা হারাম। মহিলারা অলংকার হিসেবে স্বর্ণ ব্যবহার করতে পারবে।
রাসূল (সা.)-এর আংটি কতদিন পর্যন্ত ছিল?
হযরত ইবনে ওমর (রাযি.) বলেন, রাসূলের আংটি তাঁর তিরোধানের পর প্রথমে হযরত আবু বকর (রাযি.) ব্যবহার করেছেন। এরপর হযরত ওমর (রাযি.) ব্যবহার করেছেন। এরপর হযরত উসমান (রাযি.) ব্যবহার করেছেন। এরপর উসমান (রাযি.)-এর শাসনামলে "আরিস" নামক কূপে তা পরে যায়। (বুখারী ৮৭২/২)
আরিস মসজিদে কুবার নিকটবর্তী একটি কূপ। হযরত মুয়াইকিব (রাযি.) রাসূলের (সা.)-এর এই আংটির সংরক্ষণকারী ছিলেন। রাসূল (সা.) যখন আংটি ব্যবহার করতেন, তখন মুয়াইকিব (রাযি.)-এর নিকট তা সংরক্ষিত থাকত। রাসূলের তিরোধানের পর হযরত আবু বকর ও হযরত ওমর (রাযি.)-এর যুগেও সেই রক্ষক ছিল। একদিন হযরত উসমান ও হযরত মুয়াইকিব (রাযি.) আরিস কূপে বসেছিলেন। (যেমনটা আরবদের অভ্যাস ছিল যে, শীতলতা অনুভব করার জন্য কিছুক্ষণ কূপের পানিতে বসে থাকত) সেই সময় হযরত উসমান (রাযি.) আংটিটা খুলে মুয়াইকিব-এর নিকট দিতে চাইলে অমনি আংটি কূপে পড়ে গেল। এরপর হযরত উসমান (রাযি.) এটাকে কত যে খোঁজাখুজি করলেন, কিন্তু আর পেলেন না। এই আংটি ছয় বৎসর যাবৎ উসমান (রাযি.)-এর নিকট ছিল। আল্লামা কিরমানী (রহঃ) বলেন, এই আংটিটা হযরত সুলাইমান (আঃ)-এর আংটির মত ছিল। যখনই আংটি সোলাইমানের (আঃ)-এর হাত থেকে নিরুদ্দেশ হয়ে গেল রাজত্যে বিশৃঙ্খলা দেখা দিল। এমনিভাবে বিজ্ঞ আলমেদের অভিমত যে, যে দিন থেকে এই আংটি হযরত উসমান (রাযি.)-এর হাত থেকে পড়ে গেল, সেই দিন থেকেই ইসলামী খিলাফতের শান্তি সৃঙ্খলা বিঘ্নিত হল। ফেৎনা-ফাসাদ বিস্তার লাভ করল। (হাশিয়ায়ে বুখারী ৮৭০/২, খাসায়েলে নববী ৮৩, শামী ২২৯/২)
আংটির ব্যাপারে শরয়ী বিধান ঃ

এরূপ আংটি যার মধ্যে কোন বরকতপূর্ণ নাম ও বাক্য লিখিত থাকে, তা পরিহিত অবস্থায় প্রস্রাব-পায়খানায় যাওয়া নিষেধ। হযরত আনাস (রাযি.) বলেন, রাসূল (সা.) বলেন, যখন প্রকৃতির ডাকে সাড়া দিতে যেতেন, তখন আংটিটি খুলে রেখে যেতেন। (শামায়েলে তিরমিযী) আল্লামা শামী (রহঃ) লিখেন, হানাফী মাযহাব-এর সর্বসম্মত ফতোয়া হল, সমাজের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গ যেমন বাদশাহ, বিচারপতি, মুতাওয়াল্লী প্রমুখ, তাদের জন্য মোহরাংকিত আংটি ব্যবহার করা সুন্নত। অন্যদের জন্যও জায়েয, তবে না করাই উত্তম। (শামী ২৩১/৫)

পুরুষদের জন্য শুধু রূপার আংটি ব্যবহার করা জায়েয। হানাফী মাযহাব মতে মহিলাদের জন্য সব ধরনের আংটিই ব্যবহার করা জায়েয। ইবনে বাতাশ বলেন, আংটি ব্যবহার নারীদের ক্ষেত্রে অন্যান্য অলংকার ব্যবহার করার মতই। অন্য অলংকার যেমন জায়েয, আংটি ব্যবহার করাও জায়েয। (হাশিয়া বুখারী ৮৭৩/২)

নবীজির (সা.) যুদ্ধে ব্যবহারকৃত সামগ্রী ঃ

নবীজি (সা.)-এর নিকট যুদ্ধে ব্যবহার করার মত সামগ্রীও ছিল। যাদুল মা'আদ গ্রন্থে আছে, রাসূলের নিকট তিনটি জুব্বা ছিল, যা যুদ্ধের সময় তিনি ব্যবহার করতেন এবং তাঁর নিকট বর্ম, কামান, শিরস্ত্রাণ, তীর, তরবারী, ঢালসহ সব অস্ত্রও ছিল। কিতাবুশ শিফা গ্রন্থে হযরত আমর ইবনে হারেছ (রাযি.) বর্ণনা করেন, তিনি উত্তরাধিকারে অস্ত্র রেখে গিয়েছেন। (উসওয়ায়ে রাসূল সা. ১০০, বুখারী ৪০৮/২)

হযরত মুগীরা ইবনে শো'বা (রাযি.) বলেন, তিনি তবুকের যুদ্ধে চিপা হাতা বিশিষ্ট সিরিয় জুব্বা পরিহিত অবস্থায় ছিলেন। এই হাদীস দ্বারা এটাও প্রমাণিত হয়, তিনি জিহাদের সফরের জন্য স্পেশালভাবে বস্ত্র রেখে দিতেন, যা সংকীর্ণ হত।

রাসূল (সা.)-এর তীর সম্পর্কে আলোচনা ঃ

হযরত সাঈদ ইবনে মুসাইয়েব (রাযি.) বলেন, আমি সা'দ ইবনে আবি ওয়াক্কাস (রাযি.)কে বলতে শুনেছি যে, রাসূল (সা.) উহুদের যুদ্ধে তুনির হতে তীর বের করে আমাকে দিতেন। আর বলতেন, "হে সা'দ! তোমার উপর আমার পিতামাতা উৎসর্গ হোক! তুমি তীর চালাতে থাক।" (এটা তাঁকে উৎসাহ দেওয়ার জন্য বলতেন)। হযরত সা'দ (রাযি.) গর্বভরে বলতেন, উহুদ যুদ্ধে হুজুর (সা.) স্বীয় পিতামাতাকে আমার জন্য উৎসর্গ করেছিলেন। (বুখারী ৫৮০/২)

রাসূল (সা.)-এর শিরস্ত্রাণ-এর আলোচনা ঃ

হযরত সাহল (রাযি.) বলেন, রাসূলের চেহারা মোবারক উহুদের যুদ্ধে আহত হয়েছিল। তাঁর দন্ত মোবারক শহীদ হল। তাঁর শিরস্ত্রাণের কড়া মাথায় ঢুকে

রাসূল (সা.)-এর বর্মের আলোচনা ঃ

বর্ম বলা হয় লৌহ জামাকে। যা যুদ্ধের সময় তীর-তরবারীর আঘাত থেকে নিরাপদে থাকার জন্য ব্যবহৃত হয়। সায়েব ইবনে ইয়াযিদ বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) উহুদ যুদ্ধে দু'টি লৌহবর্ম উপর নিচে পরিহিত অবস্থায় ছিলেন। (শামায়েলে তিরমিযী)। এ দু'টির নাম ছিল যথাক্রমে যাতুল ফুযুল এবং ফিজ্জাহ। আর যাতুল ফুযুল সবচেয়ে বড় বর্ম ছিল। এটাই সেই বর্ম, যা নবী (সা.) অভাব অনটনের কারণে আবু শাহাম নামক এক ইয়াহুদীর নিকট বন্ধক রেখেছিলেন। মৃত্যুর সময় পর্যন্ত সেটা সেই অবস্থায়ই ছিল। রাসূলের তিরোধানের পর সাহাবাগণ সেটার মুল্য আদায় করতঃ মুক্ত করেছিলেন। (বুখারী ৪০৯/২)

রাসূল (সা.)-এর তরবারীর আলোচনা ঃ

হযরত আনাস (রাযি.) ও সাঈদ ইবনে আবিল হাসান (রাযি.) বর্ণনা করেন, রাসূল (সা.)-এর তরবারীর বাট রূপার ছিল। (শামায়েলে তিরমিযী)

আল্লামা ইবনে সীরীন (রহ.) বলেন, আমি আমার তরবারী হযরত সামুরা ইবনে জুনদুব (রাযি.)-এর তরবারীর ন্যায় বানিয়েছি। হযরত সামুরা (রাযি.)-এর ধারণা ছিল যে, তাঁর তরবারীটা রাসূলের (সা.) তরবারীর মত ছিল। আর রাসূলের তরবারী বনু হানীফা (হানীফা নামক গোত্র)-এর তরবারীর মত ছিল। (শামায়েলে তিরমিযী)

হানিফা আরবের প্রসিদ্ধ একটি গোত্র ছিল, তরবারী বানানোর ক্ষেত্রে যাদের সুখ্যাতি ছিল। তারা পর্যায়ক্রমে সকলেই প্রিয় নবীজির (সা.) অনুসরণ করতঃ নবীজির তরবারীর সদৃশ তরবারী বানাতে লাগল। রাসূল (সা.)-এর সর্বমোট তরবারীর সংখ্যা ছিল ৯টি। (জা. অছায়েল ১৯৫)

রাসূল (সা.)-এর বর্শা ও কামান ঃ

কায়নুকা গোত্রের সাথে যুদ্ধের পর বিজিত যুদ্ধলব্ধ অস্ত্রসমূহের মধ্য হতে তিনটি বর্শা রাসূল (সা.) পেয়েছিলেন। আর তিনটি কামানও পেয়েছিলেন। কামানগুলির নাম ছিল যথাক্রমে (১) রাওহা। (২) শাওহাত। (৩) এটারই আরেক নাম ছিল বায়জা। (৩) ছাফরা। (তাবকাতে ইবনে সা'দ ৩৮৯/১)

রাসূল (সা.)-এর ঢাল-এর আলোচনা ঃ

নবীজির (সা.) একটি ঢাল ছিল, যাতে ভেড়ার মাথার ছবি আঁকা ছিল। রাসূল

(সা.) এটা অপছন্দ করলেন। অত:পর আল্লাহ তা'আলা এই ছবিটা উক্ত ঢাল হতে বিলুপ্ত করে দিলেন। (তাবকাতে ইবনে সা'দ ৪৮৯/১) اعطى قوة ثلثين او اربعين رجلا

রাসূল (সা.)-এর সাহসিকতার বর্ণনা ঃ

হযরত আনাস (রাযি.) হতে বর্ণিত, বিশ্বনবী (সা.)-এর দেহ মোবারকে ৩০ জন (বীর পুরুষের শক্তি) অন্য বর্ণনা মতে ৪০ জন বীর পুরুষের সমান শক্তি কুদরতীভাবে প্রদান করা হয়েছিল।

হযরত আয়েশা (রাযি.) বর্ণনা করেন, وصرع ركانة اشداهل زمانه حين دعاه الى الاسلام

অর্থাৎ যুগশ্রেষ্ঠ পাহ্লোয়ান রুকানাকে যখন রাসূল (সা.) ইসলামের দাওয়াত দিলেন, তখন সে এই চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিল যে, "হে মুহাম্মদ! তুমি যদি আমাকে কুস্তিতে লড়ে পরাজিত করতে পার, তাহলে আমি তোমার ধর্ম গ্রহণ করব।" তখন আল্লাহর সত্য নবী আরবের এই বিখ্যাত পাহ্লোয়ানকে পরাজিত করে দিয়েছিলেন। হযরত আয়েশা (রাযি.) এই ঘটনা বর্ণনা করার পর বলেন, বীরত্ব ও সৎ সাহসিকতায়ও প্রিয়নবী (সা.)-এর মর্যাদা সকলের চেয়ে উর্দ্ধে ছিল। তিনি সর্বাধিক শ্রেষ্ঠ বীর বাহাদুর ও নির্ভিক সৈনিক ছিলেন। অত্যন্ত দুর্গম স্থানে যেথায় নামি দামী বাহাদুররাও পা পিছলে ছিটকে পড়ে যায়, সেথাও তিনি স্বীয় স্থানে অটল ও দৃঢ়পদ থাকেন। যেমনটা কাজী ইয়াজ রচিত "শিফা" নামক গ্রন্থে উল্লেখ রয়েছে।

হযরত আলী (রাযি.) বলেন, যখন যুদ্ধের দামামা বেজে উঠত, মরণপণ লড়াই শুরু হয়ে যেত, তখন আমরা রাসূল (সা.)-এর নিরাপত্তায় চতুর্পার্শ্বে থাকতাম। তখন দেখতাম, তিনি শত্রুর সবচেয়ে নিকটে চলে যেতেন। (আর-রাহীকুল মাখুতম ৭৫৮)

হযরত বারা ইবনে আযেব (রাযি.)কে কেউ জিজ্ঞেস করেছিল, আপনারা হুনাইনের যুদ্ধে কিভাবে রাসূল (সা.)কে একা রেখে চলে গেলেন? তিনি প্রতিউত্তরে বললেন, রাসূল (সা.) পিছু হটেন নাই, বরং বাহিনীর কিছু সৈনিক হাওয়াজিন গোত্রের প্রচন্ড তীরের আঘাতে পিছু হটে গিয়েছিল বটে কিন্তু রাসূল (সা.) স্বীয় খচ্চরের উপর আরোহিত ছিলেন এবং এর লাগাম আবু সুফিয়ান ধরে রেখেছিলেন। রাসূল (সা.) তখন অত্যন্ত সাহসিকতার সাথে লড়াই চালিয়ে যাচ্ছিলেন আর বীর দর্পে (এই কবিতা) আবৃত্তি করছিলেন- انا النبى لا كذب ☆ انا ابن عبد المطلب অর্থাৎ আমি হলাম সত্য নবী, আবদুল মুত্তালিবের পৌত্র আমি।

হযরত আনাস (রাযি.) বলেন, এক রাতে মদীনাবাসী (এক ভয়ংকর শব্দ শুনে) ভয় পেয়ে গেল। কিছু সাহসী লোক আওয়াজের দিকে যেতে লাগলেন। রাস্তায় রাসূল (সা.)কে তারা প্রত্যাবর্তন করতে দেখলেন। অর্থাৎ ভয়ের স্থানে অন্যদের পূর্বেই তিনি পৌঁছে গেলেন। আর সেখানকার অবস্থা পর্যবেক্ষণ করলেন যে, এখানে কী

হয়েছে? এ সময় রাসূল (সা.) আবু তালহা (রাযি.)-এর লাগামহীন ঘোড়ায় আরোহণ করে আসছিলেন। আর গলায় তরবারী ঝুলিয়ে রেখেছিলেন। আর সকলকে অভয় দিয়ে বলছিলেন, ভয় পেয়ো না, ভয়ের কারণ নেই। (বুখারী ৪০৭/১, মুসলিম ২৫২/২)

এ বিষয়টাকে কবি মুযতার ছন্দে ছন্দে এভাবে তুলে ধরেছেন ঃ

مقابل نہ تھا کوئی دلیری اور شجاعت میں ☆ برابر تیس یا چالیس مردوں کے تھے طاقت میں

বীরত্ব ও নির্ভিকতায় তাঁর সমান ছিল না কেহ,
চল্লিশ জন পুরুষ সম শক্তিশালী তাঁর দেহ।

رکانہ پہلوان ملک عرب کا رستم......اعظم ☆ کیا اس نے یہ شرط اسلام لے آنے کی مستحکم

আরবের রুস্তম খ্যাত "রুকানা" ছিল বীর পাহলোয়ান,
কুস্তি লড়ায়ে অদ্বিতীয় ছিল কেউ ছিল না তার সমান।

میں لے آؤنگا ایمان تم سے کشتی میں اگر ہارا ☆ رسول اللہ نے پکڑا اٹھایا اور دے مسار

নবীকে বলে! পার যদি হারাতে আমায় পড়ব আমি কালেমা তোমার,
নবীজি তাকে শূণ্যে তুলে তিন তিন বার মারলের আছাড়।

প্রিয় নবীজির (সা.) হায়া তথা আত্মসম্ভ্রমবোধ ঃ

রাসূল (সা.)-এর লজ্জাশীলতার অসংখ্য ঘটনা রয়েছে। তিনি অত্যন্ত আত্মসম্ভ্রবোধ সম্পন্ন ছিলেন। তবে কোন দীনি মাসআলা বর্ণনার ক্ষেত্রে কখনো সংকোচবোধ করতেন না। অকপটে তা বর্ণনা করতেন।

হযরত ইবনে ওমর (রাযি.) বলেন, তিনি অত্যাধিক লজ্জাশীলতার দরুন কারো চেহারায় চোখে চোখ রেখে কখনো তাকাতেন না। (খাসায়েলে নববী ৩১৯)

হযরত হিন্দ বিন আবি হালা (রাযি.) বলেন, রাসূল (সা.)-এর অভ্যাস ছিল, তিনি চোখের কোন্ দ্বারা তাকাতেন। অর্থাৎ রাসূল (সা.) অধিক লজ্জাশীলতার দরুন চোখে চোখ রেখে তাকাতেন না। (শামায়েলে তিরমিযী)

হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রাযি.) বলেন, রাসূল (সা.) কোন পর্দানশীন কুমারী নারী হতেও অধিক লজ্জাশীল ছিলেন। (বুখারী ৫০৩/১, ৯০৩/২)

সাধারণত: কুমারী নারীরাতো এমনিতেই লজ্জাবতী হয়ে থাকে। এর মধ্যে আবার পর্দানশীল যারা তারাতো আরো অধিক লজ্জাবতী হয়ে থাকে। এই লজ্জা তার স্বভাবজাত। ঠিক এমনিভাবে রাসূল (সা.)-এর মধ্যে যে আত্মসম্ভ্রবোধটা ছিল, সেটাও তার স্বভাবজাত ও পরিপূর্ণভাবেই ছিল।

রাসূল (সা.)-এর ঘোষণা যে, তোমার থেকে যদি লজ্জার মত অমূল্য সম্পদ চলে যায়, তাহলে পৃথিবীর এহেন জঘন্য কাজ নেই, যা তুমি করতে পারবে না। (বুখারী ৯০৪/২)
হযরত আয়েশা (রাযি.) বলেন, রাসূল (সা.) কখনো কোন দিন আমার লজ্জাস্থানের দিকে তাকাননি। আমিও তাঁর লজ্জাস্থানের দিকে তাকাইনি। এই ছিল নবীজির সর্বাধিক প্রিয় ও অকৃত্রিম স্ত্রী হযরত আয়েশার (রাযি.) অভিব্যক্তি। আর অন্যদের অবস্থাতো বলারই অপেক্ষা রাখে না।
হযরত উম্মে সালমা (রাযি.) বলেন, রাসূল (সা.) যখন মিলনকার্য সম্পাদন করতেন, তখন চোখ বন্ধ করে নিতেন। মাথ ঝুকিয়ে নিতেন এবং স্ত্রীকেও শান্ত ও স্থির থাকতে বলতেন। (খাসায়েলে নববী ৩২১)
তবে হ্যাঁ, ইসলামী কোন বিধি-বিধান বর্ণনার বিষয় হলে, তা যত গোপনীয় বিষয়ই হোক না কেন, তা অবশ্যই ব্যক্ত করতেন। এ ছাড়া অন্যান্য ক্ষেত্রে লজ্জাশীলতা খুবই গুরুত্বপূর্ণ।
রাসূল (সা.) বর্ণনা করেছেন, লজ্জা ঈমানের অঙ্গসমূহের একটি অন্যতম অঙ্গ।
(বুখারী, কিতাবুল ঈমান ১ম খন্ড)
কবি মুযতার-এর ছন্দময় উপস্থাপনায় যা এভাবে ফুটে উঠেছে ঃ

حیاء وشرم سے آنکھیں نہ آنکھوں سے ملاتے تھے ☆ نہ نظروں کو کسی کے چہرہ پر اپنی جماتے تھے

কারো চোখে চোখ রেখে দেখতেন না তিনি লজ্জাশীলতায়,
দীর্ঘ সময় কারো পানে দেখতেন না তিনি অধিক হায়ায়।

تھی عادت دیکھنے کی گوشۂ چشم مبارک سے ☆ کہ پورا سر نہ اٹھتا دیکھ لینے کو نظر بھر کے

চোখের কোনে এক পলক দেখে নেওয়ার স্বভাব ছিল,
মাথা উঠিয়ে নয়ন ভরে দেখতে থাকার অভ্যাস না ছিল।
রাসূল (সা.)-এর হাটা চলার বর্ণনা ঃ
হযরত আলী (রাযি.) বর্ণনা করেন, রাসূল (সা.) যখন হেটে যেতেন, তখন একটু ঝুঁকে চলতেন, যেন উপর থেকে নীচের দিকে নামছেন। (শামায়েলে তিরমিযী)
তাঁর মধ্যে যেহেতু বিনয় চূড়ান্ত পর্যায়ের ছিল, সেটা তাঁর হাটা-চলাতেও প্রকাশ পেত। এমনিভাবে তিনি বীর পুরুষদের মত পা উঠিয়ে উঠিয়ে শক্ত পায়ে হাটতেন। মহিলাদের মত পা মাটিতে হেঁচড়িয়ে হাটতেন না।
হযরত ইবরাহীম ইবনে মুহাম্মদ (রহঃ) হযরত আলী (রাযি.) হতে বর্ণনা করেন, রাসূল (সা.) যখন হাটতেন, তখন শক্ত পায়ে পা উঠিয়ে উঠিয়ে চলতেন।

(শামায়েলে তিরমিযী) এবং দ্রুত চলতেন। এ যুগের প্রেমিকা ললনাদের মত ঝিমিয়ে ঝিমিয়ে চলতেন না।
হযরত আবু হুরাইরা (রাযি.) বলেন, আমি রাসূল (সা.) হতে অধিক দ্রুতগামী কাউকে চলতে দেখিনি। জমিন যেন তাঁর জন্য সংকুচিত হয়ে আসত।
আবু হুরাইরা (রাযি.) বলেন, রাসূল (সা.)তো স্বাভাবিক গতিতেই চলতেন, তবে আমরা অনুভব করতাম, তিনি খুব দ্রুত হাটছেন। তাই আমরা তাঁর সাথে চলতে চলতে হাঁপিয়ে উঠতাম। চলার সময় তিনি ডানে বামে ফিরে তাকাতেন না।
(শামায়েলে তিরমিযী, মিশকাত ৫১৮.২, বুখারী ২৭/১)
কবি মুযতারের উপস্থাপনা ঃ
قدم قوت سے اٹھتا اور جھک پڑتا تھا دھرنے میں ☆ بلندی سے جو ہیئت ہوتی ہے نیچے اترنے میں
শক্ত পায়ে চলতেন তিনি ঝুঁক ছিল তাঁর নিচের দিকে,
যেমিনভাবে ঝুঁকে কেউ নামার সময় নিচের দিকে।
طمانینت سے چلتے پاؤں رکتے تھے بڑھا کر کے ☆ تواضع سے نظر نیچی کیۓ سر جھکا کر کے
পা উঠিয়ে চলতেন তিনি গতি ছিল স্বাভাবিক,
বিনয়ী দৃষ্টি নিচে হত মাথা ঝুঁকাতেন নিচের দিক।
রাসূল (সা.)-এর বসার ধরণ ঃ
রাসূল (সা.) অধিক সময় দুই হাটু উঠিয়ে বসতেন। এর দ্বারা বিনয় প্রকাশ পায়। বসার ধরনটা ছিল এমন যে, উভয় হাটু উঠিয়ে নিতম্ব মাটিতে লাগিয়ে উভয় হাত দ্বারা পায়ের গোড়ালীকে শক্তভাবে পেঁচিয়ে ধরতেন। অথবা কোন কাপড় কোমর থেকে গোড়ালী পর্যন্ত পেঁচিয়ে নিতেন।
হযরত আবদুল্লাহ বিন ওমর (রাযি.) বলেন, আমি রাসূল (সা.)কে কাবা ঘরের আঙ্গিনায় এভাবে হাটু উঠিয়ে বসতে দেখেছি। এ কথা বর্ণনা করার সময় ইবনে ওমর (রাযি.) রাসূলের মত বসে দেখিয়ে দিলেন। (বুখারী ৯২৮/২)
হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রাযি.) বলেন, রাসূল (সা.) যখন মসজিদে অবস্থান করতেন, তখন তিনি উভয় হাটু উঠিয়ে কখনো উভয় হাটু ফেলে বসতেন।
হযরত জাবের ইবনে সামুরা (রাযি.) বলেন, রাসূল (সা.) বাহুতে হাত রেখে বসে যেতেন। (উসওয়ায়ে রাসূল সা. ১৩৩) কখনো তিনি আসন গেড়ে তথা এক পা অন্য পায়ের উপর রেখে বসে যেতেন।
হযরত হানযালা (রাযি.) বর্ণনা করেন, আমি রাসূল (সা.)-এর নিকট উপস্থিত হয়ে দেখলাম, তিনি আসন গেড়ে তথা ডান পা বাম পায়ের উপর উঠিয়ে বসে আছেন। (উসওয়ায়ে রাসূল ১৩৩)

আরবদের অভ্যাস ছিল, তারা অবসর সময় পানির শীতলতা গ্রহণ করার জন্য কূপের মুখের উপর উভয় পা পানিতে লটকিয়ে (ছড়িয়ে দিয়ে) বসে থাকত। রাসূল (সা.)ও এমনটা প্রায়ই করতেন।
হযরত আবু মুসা আশআরী (রাযি.) বলেন, আমি রাসূল (সা.)কে আরীস নামক কূপে উভয় পা ছড়িয়ে বসে থাকতে দেখেছি। এরপর পর্যায়ক্রমে আবু বকর, ওমর, উসমান (রাযি.)ও এভাবে কিছুক্ষণ বসে থাকতেন। (বুখারী ৫১৯/১)
কবি মুযতার বিষয়টাকে তাঁর ছন্দে এভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন ঃ

উভয় হাঁটু দাড় করিয়ে অধিক সময় বসতেন তিনি,
উভয় হাতে চতুর্পার্শ্বে পেঁচিয়ে ধরে বসতেন তিন।
রাসূল (সা.)-এর বাচনভঙ্গি ঃ
হযরত আয়েশা (রাযি.) বলেন, রাসূল (সা.) অন্যদের মত কথা শুধু অনর্গল বলতেই থাতেন না, বরং তাঁর প্রত্যেকটি কথা আলাদা আলাদাভাবে স্পষ্ট করে বলতেন, যাতে শ্রোতাদের হৃদয়ঙ্গম হয়ে যায়। যদি কঠিন কোন বিষয়বস্তু হত, অথবা কোন জনসভা হত, তাহলে সামনে, ডানে, বামে মুখ ঘুরিয়ে বার বার বলতেন, যাতে সবাই বুঝতে সক্ষম হয়।
হযরত আনাস (রাযি.) বলেন, রাসূল (সা.) যথাসম্ভব কথাকে তিনবার করে বলতেন, যাতে শ্রোতারা খুব ভালভাবে বুঝতে সক্ষম হয়। (শামায়েলে তিরমিযী)
এমনিভাবে তিনি কেবল প্রয়োজনীয় কথা বলতেন এবং বুঝানোর জন্য প্রয়োজন মোতাবেক হাতও নাড়তেন।
হযরত হিন্দ বিন আবি হালা (রাযি.) বলেন, তিনি প্রয়োজনের অতিরিক্ত কোন কথা বলতেন না। আর বলার সময় হাতও নাড়তেন। কখনো ডান হাতের তালু বাম হাতের বৃদ্ধাঙ্গুলীর উপর মারতেন। তিনি কথাকে স্পষ্ট ভাষায় যথাযথভাবে বলতেন এবং অধিক অর্থবোধক শব্দ দ্বারা কথা বলতেন। (যাকে জাওয়ামিউল কালিম তথা "শব্দ কম অর্থ বেশি বলা" হয়ে থাকে।) (শামায়েলে তিরমিযী)
উম্মে মা'বাদ খাযাঈয়া (রাযি.) বলেন, তিনি স্পষ্ট ও মিষ্টভাষী ছিলেন। তিনি প্রয়োজনীয় কথা অবশ্যই বলতেন, তবে বাচালদের ন্যায় অনর্গল কথা শুধু বলতেই থাকতেন না। তাঁর একেকটি কথা যেন মুক্তার দানার মত ছিল। (নশরুত্তীব)
রাসূল (সা.) দুর্লভ বিচক্ষণতা ও আরবদের সব অঞ্চলের ভাষায় পারঙ্গম ছিলেন। তিনি প্রত্যেক কবিলার (গোত্রের) লোকদের সাথে তাদের পরিভাষা অনুযায়ী কথা

বলতেন। (আর-রাহীকুল মাখতুম ৭৫০)
তিনি যদি মসজিদে নববীতে খুতবাহ দিতেন, তখন লাঠিতে ভর করে দিতেন। আর জিহাদের ময়দানে কামানে ভর দিয়ে ভাষণ দিতেন।
কবি মুযতার-এর নান্দনিক উপস্থাপনা ঃ

کبھی جب گفتگو فرماتے تھے موتی پیروتے تھے ☆ کہ . الفاظ واضح غیر مبہم صاف ہوتے تھے

কখনো যদি কথা বলতেন মুক্তা ঝরতো জবান দ্বারা,
জড়তা ছিলনা কথাতে তাঁর অস্পষ্টতার নেই ইশারা।

اگر الفاظ گنتا کوئی گن لیتا تھا آسان تر ☆ کہ ہر اک لفظ بالفصل فرماتے تھے منہ بھر کر

অল্প কথা বলতেন তিনি শব্দ গুলোও গুনা যেত,
ধীরে ধীরে বলতেন তিনি পরিপূর্ণ তা বুঝা যেত।

রাসূল (সা.)-এর চুপ থাকা ঃ
হযরত হিন্দ ইবনে আবি হালা (রাযি.) বলেন- রাসূল (সা.)-এর প্রতিটা মূহূর্ত উম্মতের চিন্তায় এবং আখেরাতের ব্যাপারে গভীর ভাবনায় ডুবে থাকতেন। প্রয়োজন ছাড়া কোন কথাই বলতেন না। দীর্ঘ সময় চুপচাপ থাকতেন। এমনকি অযথা কথা বলা থেকে অন্যদেরকে তিনি নিজেই বারণ করতেন।
হযরত মুয়ায (রাযি.) বলেন-রাসূল (সা.) বলেছেন, তোমরা ভাল কথা বল আর জান্নাতের পাথেয় সংগ্রহ করে নাও। আর মন্দ কথা পরিহার কর নিরাপদে থাকতে পারবে। কারণ বেশির ভাগ লোকদেরকে মুখ নিচের দিকে করে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে শুধু জবানের অযথা কথা বলার কারণে। (হায়াতুস সাহাবা ৭৩৭)
হযরত আনাস (রাযি.) বলেন, কোন ব্যক্তি আল্লাহভীরু হতে পারবে না যাবৎ সে অযথা কথা পরিহার না করবে। (হায়াতুস সাহাবা ৭৪০)
একদিন হযরত আবু বকরের (রাযি.) খাছ কামরায় হযরত ওমর (রাযি.) উঁকি মারলেন। দেখলেন যে, তিনি জিব্বাকে ধরে টানছেন। এ দৃশ্য দেখে ওমর (রাযি.) জিজ্ঞেস করছেন। হে রাসূলের খলীফা! আপনি এসব কী করছেন? আবু বকর (রাযি.) বলেন, এই জিব্বাই তো আমাকে ধ্বংসের খাঁদে নিক্ষেপ করে দিয়েছে। রাসূল (সা.) বলেছেন, দেহের এমন কোন অঙ্গ নেই, যা জিব্বার অনিষ্টতার অভিযোগ করে না। (হায়াতুস সাহাবা ৭৩৮পৃষ্ঠা)
চুপ থাকা কাকে? বলে-যে কোন কাথা না বলে।
কবি মুযতার-এর অপূর্ব উপস্থাপনা ঃ

ضرورت بولنے کی جب نہ ہو خاموش رہتے تھے ☆ کہ ہرگز بے محل اور بے ضرورت کچھ نہ کہتے تھے

প্রয়োজন ছাড়া কোন কথা বলতেন না তিনি কভু,

অযথা কথা বলে তিনি সময় কাটাতেন না আদৌ।

ہمیشہ آخرت کی فکر میں مغموم و رنجیدہ ☆ کبھی راحت نہ پاتے ہر گھڑی افسردہ و زلیدہ
আখেরাতের চিন্তায় সদা অস্থির থাকতেন তিনি
স্বস্থি তিনি পেতেন না কভু উম্মতের পেরেশানী ।

রাসূল (সা.) যেভাবে আনন্দ করতেন ঃ

হযরত কা'ব ইবনে মালেক (রাযি.) বলেন, রাসূল (সা.) যখন আনন্দিত হতেন, তখন তাঁর নূরানী চেহারা টকটকে লাল বর্ণের হয়ে যেত । যেন পূর্ণিমা । (বুখারী ৫.২/১) যখন তিনি আনন্দিত হতেন, তখন দৃষ্টি অবনত করে নিতেন ।
(খাসায়েলে নববী ৪৩৩)

রাসূল (সা.) হাসতেন যেভাবে ঃ

হযরত আয়েশা (রাযি.) বলেন, আমি রাসূল (সা.)কে এত অধিক পরিমাণে হাসতে দেখিনি, যাতে তাঁর আলা জিহ্বা বের হয়ে যায় । তিনি তো কেবল মুচকি হাসতেন ।
(বুখারী ৯০০/২)

অন্য বর্ণনা মতে রাসূল (সা.) আখেরাত ও উম্মতের চিন্তায় অধির হয়ে থাকতেন, তবে তিনি মুচকি হাসতেন অধিক পরিমাণে ।

আব্দুল্লাহ ইবনে হারেস (রাযি.)-এর বর্ণনা ঃ তিনি বলেন, আমি রাসূল (সা.) থেকে অধিক পরিমাণে মুচকি হাসার লোক আর দেখিনি । (শামায়েলে তিরমিযী)

তবে তাঁর মুচকি হাসা অন্যদের মন জয় করার জন্য, যাতে সাহাবাগণ সন্তুষ্ট থাকেন এই জন্য সদা হাসিমুখে থাকতেন । হযরত জাবির (রাযি.) বলেন, আমি যে দিন থেকে মুসলমান হলাম, সেদিন থেকে কোনদিন আমাকে তার খেদমতে হাজির হওয়া থেকে নিষেধ করেন নাই । আর তিনি যতবার আমাকে দেখতেন, ততবারই মুচকি হাসি দিতেন । (বুখারী-৯০০/২)

কখনো তিনি বড় হাসিও দিতেন, যাতে তাঁর সামনের দাঁতের আলোকরশ্মি দেখা যেত । তবে এমনটা বিশেষ কোন ঘটনা ছাড়া সচরাচর দেখা যেত না । সে রকম মজার কয়েকটি ঘটনা পাঠকদের উদ্ধেশ্যে নিম্নে প্রদান করা হল ।

১ম ঘটনা ঃ বুখারী শরীফে হযরত আবু হুরায়রা (রাযি.) হতে বর্ণিত হয়েছে, এক ব্যক্তি রাসূল (সা.)-এর খেদমতে উপস্থিত হয়ে ব্যক্ত করতে লাগল, "ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি ধ্বংস হয়ে গেছি! আমি রোযা অবস্থায় স্ত্রী সহবাস করে ফেলেছি ।" রাসূল (সা.) তাকে বললেন "একটি দাস মুক্ত করে এর কাফ্ফারা আদায় করে দাও!" সে বলল, "আমার কাছে তো দাস নেই যে মুক্ত করে দেব"

হযরত আয়েশা (রাযি.) বলেন, আমি হায়েজ (ঋতুবর্তী) অবস্থায়ও রাসূল (সা.)-এর চুল আচড়িয়ে দিতাম। (বুখারী ৮৭৮/২)
এই হাদীস দ্বারা এটাও প্রমাণিত হল যে, স্ত্রী ঋতুবর্তী অবস্থায় স্বামীর খেদমত করতে পারে, তবে সহবাস করতে পারবে না। রাসূল (সা.) চুল আচড়ানোর সময় মাথার মাঝখানে সিঁথিও কাটতেন। যেমনটা ইবনে আব্বাস (রাযি.)-এর বর্ণনায় আছে যে, নবী (সা.) প্রথম যুগে যখন কোন বিধান নাযিল হত না, তখন আহলে কিতাবদের নিয়ম পালন করতেন। আর আহ্লে কিতাবরা মাথার সিঁথি কাটতেন না। আর মুশরিকরা সিঁথি কাটতো। এই জন্য রাসূল (সা.) প্রথমতঃ চুলে সিঁথি না কেটে এমনিই ছেড়ে রাখতেন। পরে তিনি সিঁথি কাটা আরম্ভ করলেন। (বুখারী ৮৭৭/২)
মাথার মাঝখানে সিঁথি কাটা সুন্নত। এক হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে, ১০টি বিষয় আছে, যা পূর্ববর্তী নবীগণের সুন্নত। তন্মধ্যে ১টি হলো মাথার মাঝখানে সিঁথি কাটা। চুল আচড়ানোর আদব হলো, প্রথমে ডান দিক থেকে আচড়ানো শুরু করা। হযরত আয়েশা (রাযি) বলেন, রাসূল (সা.) যথাসাধ্য চেষ্টা করতেন, প্রত্যেকটা কাজ ডান দিক হতে আরম্ভ করার। এমনকি চুল আচড়ানোও (বুখারী ৮৭৮/২)
রাসূল (সা.)-এর চুলে তেল ব্যবহার করা ঃ
হযরত আনাস (রাযি.) বর্ণনা করেন, রাসূল (সা.) অধিকাংশ সময় মাথার চুলে তেল ব্যবহার করতেন আর দাড়ী আচড়াতেন। আর মাথার উপরে এক টুকরা কাপড় রেখে দিতেন, যা অধিক পরিমাণে তেল লাগার কারণে তৈলের কাপড় বলেই মনে হত। (শামায়েলে তিরমিযী)
যাদুল মা'আদে আছে, তিনি যখন মাথায় তৈল লাগাতেন, তখন কপালের দিক হতে আরম্ভ করতেন। বাম হাতের মুঠোর ভিতরে তৈলটা রাখতেন, প্রথমে চোখের ভ্রুতে তৈল দিতেন, এরপর চোখের পলকে দিতেন, এরপর মাথায় দিতেন। আর যখন দাড়ীতে তৈল লাগাতেন, তখন প্রথমে চোখের ভ্রুতে লাগাতেন এরপর দাড়ীর পিছন দিক হতে ঘারের দিক হতে দেয়া আরম্ভ করতেন।
(উসওয়ায়ে রাসূল সা. ১২৯)
রাসূল (সা.)-এর চুল কাটার নিয়ম ঃ
তার চুল কাটার নিয়মটা এমন যে হয়ত পূরা মাথা মুন্ডিয়ে ফেলতেন আর না হয় পূরা মাথায় চুল রাখতেন। মাথার এক অংশ চুল কেটে অপর অংশ চুল রেখে দেয়া এমনটা তিনি করতেন না। আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রাযি.) বলেন, মাথার দু পার্শ্বে ও কপালের দিকে চুল রেখে অন্য দিকে চুল কাটতে রাসূল (সা.) সম্পূর্ণ নিষেধ করেছেন। (বুখারী ৮৭৭)

অর্থাৎ মাথার একদিকে চুল লম্বা রেখে অপর পার্শ্বের চুল খুব ছোট করে কাটা এটা রাসূল (সা.) নিষেধ করেছেন। এই পদ্ধতি না জায়েয। মাথা মুন্ডানো এটা রাসূল (সা.) একমাত্র কয়েকবার হজ্জ্ব ও ওমরাহ ইত্যাদির ক্ষেত্রে করেছেন। এছাড়া রাসূল (সা.) অধিকাংশ সময় বাবরী চুল রাখার অভ্যাস ছিল। এই জন্য যদি সম্ভব হয়, তাহলে সুন্নত হিসেবে বাবরী চুল রাখা উচিত।

রাসূল (সা.)-এর বগলের পশম পরিস্কার করা ঃ

রাসূল (সা.) বলেছেন, বগলের পশম পরিস্কার করা পূর্ববর্তী নবীগণের সুন্নত। (বুখারী ৮৫৭/২) রাসূল (সা.) বগলের পশম উপরিয়ে ফেলতেন। এটাই সুন্নত। তবে যদি কারো উপরিয়ে ফেলা ভীষণ কষ্টদায়ক হয়, তাহলে মুন্ডিয়ে ফেলা যথেষ্ট হবে। অপারগতাবশতঃ এটাকেও সুন্নত হিসেবে ধরা হবে। (হাশিয়ায়ে বুখারী ৮৭৫/২)

হযরত আনাস (রাযি.) বলেন, বগলের পশম পরিস্কার করার সর্বোচ্চ মেয়াদ হল ৪০ দিন। এটাই রাসূল (সা.) নির্ধারণ করে দিয়েছেন। (মুসলিম ১২৯/১)

রাসূল (সা.)-এর নাভীর নিচের পশম পরিস্কার করা ঃ

রাসূল (সা.) বলেছেন, নাভীর নিচের পশম পরিস্কার করা পূর্ববর্তী নবীগণের সুন্নত। (বুখারী ৮৭৫/২)

হযরত আনাস (রাযি.) বলেন, রাসূল (সা.) আমাদেরকে নাভীর নিচের চুল পরিস্কার করার মেয়াদ নির্ধারণ করে দিয়েছেন সবোর্চ্চ ৪০ দিন। (মুসলিম ১২৯/২)

অর্থাৎ ৪০ দিন অতিবাহিত হওয়ার আগেই তা পরিস্কার করা উচিত। কোন কোন বর্ণনা মতে রাসূল (সা.) এগুলি কমিয়ে পরিস্কার করতেন। কোন কোন বর্ণনা মতে রাসূল (সা.) খুর ব্যবহার করতেন। যেভাবেই হোক তা পরিস্কার করা চাই। তবে পুরুষদের জন্য মুন্ডিয়ে পরিস্কার করা উত্তম। আর ৪০ দিনের বেশি সময় অপরিস্কার অবস্থায় থাকলে গোনাহগার হবে।

রাসূল (সা.)-এর গোফ কর্তন ঃ

রাসূল (সা.) নিজেও গোফ অত্যন্ত ছোট করে কাটতেন এবং অন্যদেরকেও নির্দেশ দিতেন। রাসূল (সা.) বলেন, গোফ কর্তন করা পূর্ববর্তী নবীগণের সুন্নত। (বুখারী ৮৭৫/২)

হযরত আনাস (রাযি.) বলেন, গোফ কাটার সবোর্চ্চ মেয়াদ ৪০ দিন নির্ধারণ করে দিয়েছেন রাসূল (সা.)। (মুসলিম ১২৯/১)

হযরত ইবনে ওমর (রাযি.) হতে বর্ণিত রাসূল (সা.) বলেন, তোমরা দাড়ী লম্বা রাখ আর গোফ কেটে খুব ছোট করে রাখ। কারণ মুশরিকরা দাড়ী কেটে ছোট করে রাখে আর গোফ লম্বা রাখে। ইমাম বুখারী (রহঃ) বলেন, এই হাদীস বর্ণনাকারী ইবনে ওমর (রাযি.) গোফ কেটে এত ছোট করে রাখতেন যে, চামড়া

পর্যন্ত দেখা যেত। অর্থাৎ চামড়া দেখা যায়; এ পরিমাণ কেটে রাখাই উত্তম।
(বুখারী ৮৭৫/২)
দাড়ীর অতিরিক্ত চুল কেটে ফেলা ঃ
রাসূল (সা.) কখনো কখনো দাড়ীর অতিরিক্ত চুল, যা এদিক-সেদিক এলোমেলো উড়তে থাকত এবং অসুন্দর দেখা যেত, সেগুলি কেটে ফেলতেন, যাতে দেখতে অসুন্দর না দেখায়।
(সীরাতে মুস্তফা রব্বানী ৫৩৪/২)
দাড়ী এক মুষ্ঠি পরিমাণ হওয়ার পর এলোমেলো চুলগুলি কেটে ফেলা (যা দেখতে অসুন্দর দেখায়) জায়েজ আছে, তবে এক মুষ্ঠি হওয়ার পূর্বে কাটা কোন অবস্থাতেই জায়েয নেই।
(উসওয়ায়ে রাসূল সা. ১৩২)
বিঃ দ্র ঃ দাড়ী এক মুষ্ঠি পরিমাণ রাখা সকল ইমামগণের মতানুসারে ওয়াজিব। এর কম কর্তন করা হারাম। কর্তনকারী ফাসেক হিসেবে গণ্য হবে।
রাসূল (সা.)-এর নখ কাটার নিয়ম ঃ
রাসূল (সা.) বলেছেন, নখ কাটা পূর্ববর্তী নবীগণের সুন্নত। (বুখারী ৮৭৫/২)
রাসূল (সা.) পনের দিন পর পর নখ কাটতেন বা কাউকে দিয়ে কাটাতেন।
(উসওয়ায়ে রাসূল ১৩১)
রাসূল (সা.)-এর হাতের নখ কাটার নিয়ম ছিল প্রথমে ডান হাতের শাহাদাৎ আঙ্গুল থেকে শুরু করে কনিষ্ঠা পর্যন্ত। এরপর বাম হাতের কনিষ্ঠা হতে শুরু করে বৃদ্ধাঙ্গুলী পর্যন্ত কাটতেন। এরপর ডান হাতের বৃদ্ধাঙ্গুলী কাটতেন সবার শেষে। পায়ের নখ কাটার নিয়ম ছিল প্রথমে ডান পায়ের কনিষ্ঠা হতে কাটা আরম্ভ করে ধারাবাহিকভাবে বৃদ্ধাঙ্গুলী পর্যন্ত কাটতেন। এরপর বাম পায়ের বৃদ্ধাঙ্গুলী হতে আরম্ভ করে কনিষ্ঠা পর্যন্ত ধারাবাহিকভাবে কাটতেন। (হাশিয়ায়ে বুখারী শরীফ ৮৭৫/২)
আবু দাউদ শরীফে আছে, মহিলাদের আঙ্গুলে মেহেদী দেওয়া উচিৎ।
(উসওয়ায়ে রাসূল সা. ১৩২)
এ যুগের ফ্যাশন হিসেবে নেইল পালিশের ব্যবহার ব্যাপক বিস্তৃতি লাভ করছে। এটা বিজাতীয়দের প্রথা, যা বর্জনীয়। নেইল পালিশ লাগানে অবস্থায় ওযূ গোসল করলে ওযূ গোসল হবে না। ওযূ বা গোসলের আগে খুব ভালোভাবে ঘষে তা উঠিয়ে ফেলতে হবে। আর ওযূ গোসল শুদ্ধ না হলে নামাযও হবে না।
হযরত আনাস (রাযি.) বলেন, রাসূল (সা.) আমাদেরকে বলেছেন, নখ কাটা ছাড়া যেন কেউ ৪০দিন অতিবাহিত না করে, এর আগে অবশ্যই কেটে ফেলতে হবে।
(মুসলিম ১২৯/১)

রাসূল (সা.) প্রাকৃতিক প্রয়োজন সারতেন যেভাবে ঃ

রাসূল (সা.) প্রাকৃতিক প্রয়োজন সারার সময় পর্দার প্রতি বিশেষ খেয়াল রাখতেন। হযরত আনাস (রাযি.) বলেন, রাসূল (সা.) যতক্ষণ পর্যন্ত নির্দিষ্ট স্থানে পৌঁছে না যেতেন, ততক্ষণ পর্যন্ত কাপড় উঠাতেন না। (তিরমিযী ১০/১)

হযরত মুগীরা ইবনে শো'বা (রাযি.) বলেন, আমি একদিন রাসূল (সা.)-এর সফরসঙ্গী ছিলাম। তাঁর প্রাকৃতিক প্রয়োজন দেখা দিলে, তিনি অনেক দূরে চলে গেলেন।
(তিরমিযী ১২/১)

এটাতো সফরের ঘটনা, এমনকি মক্কা বা মদীনায় থাকা অবস্থায়ও জনবসতি থেকে প্রায় দেড় দুই মাইল দূরে চলে যেতেন। মদীনায় আসার কিছু দিন পর ঘরের পার্শ্বেই যখন এটার ব্যবস্থা হয়ে গেল তখন এই প্রয়োজন এখানেই সারতেন। অন্য এক বর্ণনায় এসেছে, রাসূল (সা.) পায়খানা করার জন্য নিচু জমীন নির্বাচন করতেন আর প্রশ্রাব করার জন্য নরম জমীন নির্বাচন করতেন এবং কোন কিছুর আড়ালে বসে মলমূত্র ত্যাগ করতেন। (তিরমিযী ১২/১)

আর যদি আড়াল করার মত কোন কিছু না পেতেন, তাহলে আল্লাহ তা'আলার পক্ষ হতে আড়াল করার ব্যবস্থা হয়ে যেত। এটা ছিল রাসূল (সা.)-এর মু'জিযা। হযরত জাবের (রাযি.) বলেন, আমি একদিন রাসূল (সা.)-এর সফরসঙ্গী ছিলাম। আমরা একটি প্রশস্ত উপত্যকায় অবস্থান করলাম। ঘটনাক্রমে রাসূল (সা.)-এর প্রাকৃতিক প্রয়োজন দেখা দিলে তা পুরণ করার জন্য তিনি উপত্যকার দিকে এগিয়ে গেলেন। কিন্তু আড়াল করার মত কোন কিছু বাহ্যিকভাবে ছিল না। হঠাৎ দু'টি খেজুর বৃক্ষের একটির নিকট গিয়ে এর ডাল ধরে বলতে লাগলেন, "আল্লাহর হুকুমে তুমি আমার অনুসরণ কর।" সাথে সাথে বৃক্ষটি তাঁর সঙ্গে চলতে লাগল। তিনি অন্য বৃক্ষটির নিকট গিয়েও অনুরূপ বলার পর সেটাও তাঁর অনুসরণ করল। রাসূল (সা.) উভয় বৃক্ষকে পাশাপাশি দাঁড় করিয়ে বৃক্ষদ্বয়ের আড়ালে প্রাকৃতিক প্রয়োজন সেরে আমাদের নিকট প্রত্যাবর্তন করলেন। জাবের (রাযি.) বলেন, আমি স্বস্থানে বসে মনে মনে কিছু ভাবছিলাম, হঠাৎ দেখি রাসূল (সা.) ফিরে এসেছেন। আর বৃক্ষ দু'টিও স্ব স্ব স্থানে গিয়ে দাঁড়িয়ে গেল। (মেশকাত ৫৩৩/২ ও মুসলিম)

তিনি ইস্তিন্জা করার সময় পানিও সাথে নিয়ে যেতেন। তিনি ঢিলা কুলুপও ব্যবহার করতেন, তবে কোন প্রাণীর মল, গোবর, হাড্ডি এমনকি যে কোন সম্মানজনক বস্তু দ্বারা ঢিলা ব্যবহার করতে নিষেধ করেছেন। (বুখারী ২৭/১)

হযরত আনাস (রাযি.) বলেন, তিনি যখন ইস্তিঞ্জাখানায় যাওয়ার ইচ্ছা করতেন, তখন এই দোয়া পড়তেন ঃ غفرانك الحمد لله الذى اذهب عنى الاذى وعافانى

তিনি ক্বিবলার দিকে মুখ করে এবং ক্বিবলার দিকে পিঠ করে ইস্তেঞ্জা করতে নিষেধ করেছেন। (বুখারী ২৬/১) ইস্তিঞ্জাখানায় প্রবেশের সময় এই দোয়া পড়তেন ঃ

(তিরমিযি ৭/১) কোন বর্ণনায় শুধু শব্দ আছে।
রাসূল (সা.)-এর পানাহার সম্পর্কে আলোচনা
রাসূল (সা.)-এর জীবন যাপন ঃ
হযরত আয়েশা (রাযি.) তাঁর ভাগিনা উরওয়াহ (রাযি.)-এর নিকট বর্ণনা করেন, দুই মাস পার হয়ে তিন মাস চলে যেত তবুও নবীর ঘরের উনুলে আগুন জ্বলত না। অর্থাৎ পাকানোর মত কিছুই থাকত না। তখন উরওয়াহ (রাযি.) বললেন, "খালাআম্মা! তাহলে কী খেয়ে আপনারা জীবন বাচাতেন?" আয়েশা (রাযি.) বলেন, কেবল পানি আর খেজুর খেয়ে। তিনি আরও বলেন, আনসারীদের মধ্যে রাসূল (সা.) এর এমন ক'জন সুহৃদ প্রতিবেশী ছিল, যারা দুধওয়ালা প্রাণী পালতেন, তাঁরা রাসূল (সা.)কে দুধ হাদীয়া পাঠালে তা আমাদের ভাগ্যেও জুটে যেত।
(বুখারী ৯৫৬/২)
হযরত মাছরুক (রাযি.) বলেন, একদিন আমি হযরত আয়েশার (রাযি.) নিকট গেলে তিনি আমার জন্য খানা পরিবেশন করলেন আর বললেন, আমি কখনো পেট ভরে খানা খাই না। আমার তো কাঁদতে মন চায়! আমি কাঁদতে থাকি! আমি জানতে চাইলাম যে, আপনি কেন কাঁদেন? তিনি বলেন, রাসূল (সা.)-এর জীবন-যাপনের অবস্থা মনে করে করে আমি কাঁদি। কারণ রাসূল (সা.) আমাদেকে ঐ অবস্থায় রেখে দুনিয়া থেকে বিদায় নিলেন, যখন তিনি কোনদিন দুই ওয়াক্ত রুটি ও গোস্ত দ্বারা পেট ভরে খেতে পাননি। (শামায়েলে তিরমিযী)
এক হাদীসে আছে, একদা আবু বকর (রাযি.) বকরীর একটি পা রাসূল (সা.)-এর নিকট হাদিয়া পাঠালেন। তখন রাতের বেলা ছিল। হযরত আয়েশা (রাযি.) এটাকে রাতের অন্ধকারেই টুকরা টুকরা করতে লাগলেন। কেউ বলল যে, ঘরে বাতিও নেই? হযরত আয়েশা (রাযি.) বলেন, বাতি জ্বালানোর মত তেল (জয়তুনের) যদি থাকত, তাহলে তা খাওয়াতেই ব্যবহার করা হত।
"জামউল অসায়েল" গ্রন্থে আছে, প্রায় দেড় মাস চলে যেত, তবুও রাসূল (সা.)- এর ঘরে বাতি জ্বালানোর মত তেল থাকত না। কোন কিছুও বাতি জ্বালানোর মত থাকত না। (খাসায়েলে নবী ৩৩৪) এই ছিল বিশ্ব নবীর (সা.) জীবন-যাপন। তিনি যদি চাইতেন, তাহলে স্বর্ণের পাহাড় তাঁর জন্য চলমান করে দেয়া হত। সকল ধন ভান্ডারের চাবি তাঁর হাতে

দেয়া হত। কিন্তু! সব কিছুকে তিনি দু'পায়ে দলে ফকীরি জীবন বেছে নিয়েছেন। তিনি নিজেই বলেছেন, আল্লাহ তা'আলা আমার জন্য মক্কার পাহাড়গুলিকে স্বর্ণ বানিয়ে দিতে চাইলেন! আমি বললাম, হে আল্লাহ! আমি তা চাই না! আমি তো এক বেলা খাব! আর তোমার শুকরিয়া আদায় করব। আবার আরেক বেলা উপবাস থাকব, তখন সবর করব। (খাসায়েলে নববী ৩৩২)

হযরত আবু হুরায়রা (রাযি.) বলেন, কিছু লোকের সামনে ভুনা বকরী ছিল, তারা তাঁকে তা খেতে আহবান করলে তিনি খেতে অস্বীকার করলেন, আর বললেন, রাসূল (সা.) দুনিয়া থেকে চলে গেছেন এরূপ অবস্থায়, যখন যবের রুটি দ্বারা পেট ভরে খেয়ে যেতে পারেননি।
(বুখারী ১৫/২)

কবি মুযতার তাঁর কবিতার ছন্দে নবী জীবনের এই করুণ ও বাস্তব চিত্রটি যথার্থ ভাবেই ফুটিয়ে তুলতে সক্ষম হয়েছেন ঃ

ترىسٹھ سال کی عمر مبارک آپ نے پائی ☆ مسلسل تین دن بھی پیٹ بھر روٹی نہیں کھائی

তেষট্টি বছরের এক বর্ণাঢ্য জীবন পেয়েছিলেন তিনি,
কিন্তু কোনদিন সব বেলা পেট ভরে খেয়ে যেতে পারেননি।

کھجوروں اور پانی پر معیشت گھر چلتی تھی ☆ گذر جاتے مہینے آگ چولہے میں نہ جلتی تھی

খেজুর আর পানিই হত জীবন বাঁচানোর উপকরণ,
মাসের পর মাস কেটে যেত তবুও উনূনে জ্বলত না আগুন।

کئی رات اور دن فاقوں سے اپنے کاٹ دیتے تھے ☆ شکم پر بھوک کی شدت میں پتھر باندھ لیتے تھے

কত রাত কত দিবস কেটে যেত তাঁর অর্ধাহার অনাহারে
অবশেষে বেঁধে নিতেন পাথর তাঁর ক্ষুধার্ত উদরে।

তিনি যেভাবে খানা খেতেন ঃ

হযরত আনাস (রাযি.) বলেন, তিনি কোনদিন টেবিলে রেখে খানা খেতেন না এবং ছোট রেকাবীতেও খানা খাননি। তাঁর জন্য মিহিন আটার পাতলা রুটি (চাপাতি)ও বানানো হয়নি। হযরত ইউনুস (রহ.) যিনি এই হাদীসের বর্ণনাকারী তিনি বলেন, আমি কাতাদাহ (রাযি.)কে জিজ্ঞেস করলাম, তাহলে তিনি কিসের উপর রেখে খানা খেতেন। কাতাদাহ (রাযি.) বলেন, চামড়ার দস্তরখানের উপর রেখে।
(বুখারী ৮১৫/২)

টেবিল ও চেয়ারে বসে রেকাবীতে খানা খাওয়া অহংকারীদের স্বভাব। মানবতার নবী এই স্বভাব পছন্দ করতেন না। হযরত কা'ব ইবনে মালেক (রাযি.) বলেন, তিনি তিন আঙ্গুল ব্যবহার করে খানা খেতেন। খানা শেষে আঙ্গুলগুলিকে চেটে খেতেন। কা'ব (রাযি.) আরও বলেন, তিনবার করে আঙ্গুল চেটে নিতেন।

আঙ্গুল চাটার ক্ষেত্রে এই ধারাবাহিকতা অবলম্বন করতেন যে, প্রথমে মধ্যমা এর পর শাহাদাৎ আঙ্গুল এরপর বৃদ্ধাঙ্গুলী। এই তিন আঙ্গুল দ্বারা বিশ্বনবী মোস্তফা (সা.) খানা খেতেন। মোল্লা আলী ক্বারী (রহঃ) বলেন, পাঁচ আঙ্গুল দ্বারা খানা খাওয়া পেটুকদের স্বভাব। তবে হ্যাঁ, খাদ্য যদি এমন জিনিস হয়, যা পাঁচ আঙ্গুল ছাড়া খাওয়া যায় না (যেমন আমাদের দেশে ভাত), তাহলে কোন সমস্যা নেই। প্রয়োজন ছাড়া (রুটি খাওয়ার সময়) পাঁচ আঙ্গুল ব্যবহার না করাই শ্রেয়। কেউ কেউ চেটে খাওয়াকে অভদ্রতা মনে করে থাকে। এটা তাদের জ্ঞান স্বল্পতার পরিচয়। কারণ একটু আগেই যে খাদ্যটা মজা করে খাচ্ছিল, এখন তো এরই অবশিষ্টাংশ আঙ্গুল থেকে চেটে খাচ্ছে। নাকি কোন নর্দমা থেকে তুলে এনে তা খাচ্ছে? তাহলে তা খেতে সমস্যা কোথায়?

আল্লামা ইবনে হাজার (রহঃ) বলেন, মানুষ তার নিজের কোন কাজকে পছন্দ করুক বা না করুক, তবে নবীজির সুন্নতকে ব্যঙ্গ করলে কাফের হয়ে যাওয়ার সমূহ সম্ভাবনা রয়েছে। (খাসায়েলে নববী ১১৩ পৃষ্ঠা)

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাযি.) বলেন, রাসূল (সা.) বলেন, তোমরা খানা খাওয়ার পর হাত তোয়ালে দ্বারা মুছবে না বরং তা চেটে নিবে। (বুখারী ৮২০/২)

হযরত আবু হুজাইফা (রাযি.) বর্ণনা করেন, রাসূল (রাযি.) বলেন, আমি হেলান দিয়ে খানা খাই না। (বুখারী ৮১২/২)

এ ক্ষেত্রে নিজের আলোচনা রাসূল (সা.) এই জন্য করলেন, যেন তাঁর অনুসরণ করা হয়। আলেমগণ বলেন, হেলান দেয়া চারভাবে হতে পারে। (১) ডান অথবা বাম দিকে দেয়াল অথবা বালিশ ইত্যাদিতে হেলান দিয়ে খানা খাওয়া। (২) মাটিতে হাত দ্বারা ভর দিয়ে খানা খাওয়া। (৩) চৌকুড়ী মেরে কোন গদি ইত্যাদিতে বসে খানা খাওয়া। (৪) কোমরকে কোন দেয়াল বা বালিশে লাগিয়ে খানা খাওয়া। খানা খাওয়ার এই চারটি পদ্ধতিই বর্জনীয়। যাদুল মা'আদ গ্রন্থে আছে নবী করীম (সা.) বলেছেন, আমি তো একজন দাস মাত্র। আর অন্যসব দাসরা যেমন বসে আমিও সেভাবে বসি। তারা যেভাবে খাবার খায়, আমিও সেভাবেই খাবার খাই। (উসওয়ায়ে রাসূল সা. ১০৮)

তিনি সর্বদা ডান হাত দ্বারা খাদ্য গ্রহণ করতেন এবং এ ব্যাপারে সবাইকে উৎসাহ প্রদান করতেন আর বলতেন, বাম হাতে শয়তানে খায়। হাদীসের কিতাবসমূহে এই ঘটনা একাধিক বর্ণিত হয়েছে যে, এক ব্যক্তি বাম হাতে খানা খাচ্ছিল, রাসূলুল্লাহ তাকে সতর্ক করে বললেন, তুমি ডান হাতে খানা খাবে। সে তা অমান্য করে বলল, আমি ডান হাতে খানা খেতে পারব না। রাসূলুল্লাহ (সা.) তাকে

বললেন, যাও! আর কোন দিন ডান হাতে খানা খেতে পারবে না। রাসূল (সা.) তাকে এ কথা বলতেই তার হাতটা এমনভাবে অবশ হয়ে গেল যে, তা আর শত চেষ্টা করেও মুখের নিকট নিতে পারল না। (খাসায়েলে নবীব সা. ১৪৬)

হযরত ওমর ইবনে আবি সালমা (রাযি.) যিনি রাসূল (সা.)-এর জীবন সঙ্গিনী উম্মে সালমা (রাযি.)-এর প্রথম স্বামীর সন্তান ছিলেন। আর তিনি রাসূল (সা.)-এর তত্ত্বাবধানেই বড় হয়েছেন। তিনি বলেন, আমি ছোটকাল থেকেই রাসূল (সা.)-এর তত্ত্বাবধানে থেকে বড় হয়েছি। ছোট থাকার দরুন আমি খানা খাওয়ার সময় পূরা (থালায়) পাত্রে হাত ফিরাতাম। (অর্থাৎ পাত্রের এ পাশ থেকে কিছু নিতাম ঐ পাশ থেকে কিছু) রাসূল (সা.) আমাকে বললেন, বৎস! বিসমিল্লাহ বলে ডান হাতে তোমার নিকটবর্তী স্থান হতে খাদ্য গ্রহণ কর। (বুখারী ৮১০/২)

কবি মুযতার-এর কাব্যিক বর্ণনা ঃ

وہ اکثر ویا دوزانوں بیٹھتے جب کھانا کھاتے تھے ☆ نہ تکیہ اور سہارا کچھ نہ ٹیک اپنی لگاتے تھے

তিনি দু হাটু উঠিয়ে বসে বিনয়ের সাথে খানা খেতেন,
কখনো ডান হাটু উঠিয়ে বাম পায়ে বসে খানা খেতেন।

کبھی میز اور چوکی پر نہ کھانا نوش فرماتے ☆ زمین پر بیٹھ جاتے اور دستر خوان پر کھاتے

টেবিল চেয়ার বা কোন কিছুতেই হেলান না দিয়ে খানা খেতেন,
মাটিতে বসে সাধারণের মত দস্তরখানায় খানা খেতেন।

রাসূল (সা.) এর রুটি ঃ

রাসূল (সা.)-এর রুটি অত্যন্ত সাধারণ মানের হত। অধিকাংশ সময় জবের রুটি হত। কখনো কখনো আটার রুটিরও ব্যবস্থা হত।

আর ময়দা তো রাসূল (সা.) এর সামনে আনাই হয় নাই। যেমনটা হযরত আবু হাযেম (রাযি.)-এর বর্ণনায় প্রতিয়মান হয়। আবু হাযেম (রাযি.) বলেন, আমি সাহল ইবনে সা'দ (রাযি.)কে জিজ্ঞেস করেছিলাম যে, রাসূল (সা.) কি কখনও সাদা ময়দার রুটি খেয়েছেন? তিনি বললেন, রাসূল (সা.)-এর জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত কখনও সাদা ময়দা উপস্থিত করাই হয়নি। আবু হাযেম (রাযি.) আবার জানতে চাইলেন যে, রাসূল (সা.)-এর যুগে আটা ছাকার জন্য কি কোন ছাকনী ছিল? তিনি বললেন, না। আবু হাযেম (রাযি.) বললেন, তাহলে আটা কিভাবে ছাকা হত? আর না ছেকে পাকানো হতই বা কিভাবে? তিনি বললেন, মিহিন আটা দ্বারা রুটি পাকনোর মত এত বিলাসী ব্যবস্থাপনা রাসূল (সা.)-এর যুগে ছিল না। তবে গম চাক্কিতে পিষার পর ফুঁ দিতেন; এতে গমের মোটা ছিলকাগুলি উড়ে যেত

রাসূল (সা.)-এর তরকারীর বিবরণ ঃ

রাসূল (সা.)-এর খাশির সামনের পায়ার গোশত খেতে খুব পছন্দ করতেন এবং দাঁত দ্বারা চিবিয়ে খুব মজা করে খেতেন। আর দাঁত দ্বারা চিবিয়ে খাওয়ার জন্য সবাইকে বলতেন। কেননা, এতে সহজে হজম হয় এবং শরীরের জন্যও বিশেষ উপকারী হয়। (খাসায়েলে নববী ১২৯ পৃষ্ঠা)

হযরত আবু হুরাইরা (রাযি.) বলেন, রাসূল (সা.)-এর নিকট কোথা হতে কিছু গোশত হাদিয়া এল। তন্মধ্যে তিনি খাশির পায়া খাওয়ার জন্য হাতে নিলেন। কেননা, এটা তাঁর অত্যন্ত পছন্দের ছিল। তিনি তা দাঁত দ্বারা চিবিয়ে খুব মজা করে খেলেন। (শামায়েলে তিরমিযী)

হযরত আবু উবায়দা (রাযি.) বলেন, আমি রাসূল (সা.)-এর জন্য হাড়িতে করে গোশত পাকাচ্ছিলাম, যেহেতু রাসূল (সা.)-এর খাশির সামনের পায়ার গোশত খুব পছন্দের ছিল, এই জন্য আমি তাঁর খেদমতে (সামনে) তা উপস্থিত করলাম। খাওয়ার পর রাসূল (সা.) আরও একটি আনতে বললেন, আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! খাশির সামনের পায়াতো দু'টোই হয়ে থাকে। (সুতরাং আর কোত্থেকে?) তখন মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (সা.) বললেন, ঐ সত্তার কসম, যার হাতে আমার প্রাণ! যদি তুমি এ কথা না বলতে, তাহলে যতক্ষণ আমি এটা চাইতে থাকতাম, ততক্ষণ পর্যন্ত পাতিলে এমন পায়া তুমি পেতেই থাকতে। (শামায়েলে তিরমিযী) (সুবহানাল্লাহ!) এটা ছিল রাসূল (সা.)-এর মু'জিযা। এটা অবাক হওয়ার কিছু নয়। এমন আরও অসংখ্য ঘটনা রাসূল (সা.)-এর জীবনে সংঘটিত হয়েছে। পাঠকদের অবগতির জন্য নিম্নে এর কয়েকটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেয়া হল ঃ

(১) হযরত আনাস (রাযি.) বলেন, একদা রাসূল (সা.) তাঁর সাহাবাগণকে নিয়ে মদীনার নিকটবর্তী খাওরা নামক স্থানে অবস্থান করছিলেন। ঘটনাক্রমে তাঁদের নিকট ওযূ করার মত প্যানি ছিল না। রাসূল (সা.) একটি পানির পাত্র আনালেন যার নিচে অল্প পানি ছিল। তিনি ঐ পাত্রে পবিত্র হস্তখানি রাখা মাত্রই আঙ্গুল হতে ঝরনার মত পানি প্রবাহিত হতে লাগল। (সুবহানাল্লাহ!) আর উপস্থিত সকল সাহাবা এর থেকে ওযূ ও প্রয়োজনীয় কাজ সারতে লাগলেন। হযরত কাতাদাহ (রাযি.) বলেন, আমি হযরত আনাস (রাযি.)কে জিজ্ঞেস করলাম, আপনারা তখন কতজন লোক সেখানে উপস্থিত ছিলেন? তিনি বললেন, প্রায় তিন শত-এর কাছাকাছি। (বুখারী ৫০৪/২)

(২) হযরত সামুরা (রাযি.) বলেন, একবার কোথা হতে এক পাত্র গোশত রাসূল (সা.)-এর নিকট হাদিয়া এল। আর রাসূল (সা.)-এর নিকট ঐ দিন সকাল হতে সন্ধ্যা পর্যন্ত মেহমান আসতেই ছিল। কিন্তু কী আশ্চর্য ব্যাপার যে মাত্র এক পাত্র গোশত সকলে পেট পুরে খাওয়ার পরও অবশিষ্ট রয়ে গেল। (খাসায়েলে নববী ১৩১)

(৩) হযরত জাবের (রাযি.) বর্ণনা করেন, খন্দক যুদ্ধের সময় আমি রাসূল (সা.)কে প্রচন্ড ক্ষুধার্ত অবস্থায় পেলাম। তখন আমরা পরিখা খনন করতে যেয়ে তিন দিন পর্যন্ত কোন খাদ্যদ্রব্য আস্বাদন করার সুযোগ আর হয়নি। রাসূল (সা.) প্রচন্ড ক্ষুধার যন্ত্রণায় অবশেষে পেটে পাথর বেঁধে রেখেছিলেন। আমি এ দৃশ্য দেখে সহ্য করতে না পেরে বাড়ীতে দৌড়ে এসে স্ত্রীকে জিজ্ঞেস করলাম ঘরে খাবার কী আছে জলদি বল? কারণ আমি রাসূল (সা.)কে প্রচন্ড ক্ষুধায় পেটে পাথর বাঁধা অবস্থায় রেখে এসেছি। স্ত্রী বলল, একটি বকরীছানা আছে, আর এই থলেতে অল্প পরিমাণ জব আছে। আমি বকরীছানা জবাই করে গোশত চুলায় পাকাতে দিলাম আর স্ত্রী জব পিষে এটা দ্বারা রুটি পাকাতে আরম্ভ করল। আমি দৌড়ে এসে রাসূল (সা.)কে কানে কানে আমার বাড়ীতে খেতে যেতে দাওয়াত দিলাম। (যেহেতু খাদ্য সামগ্রী অল্প ছিল, বেশী লোকের জন্য তা পর্যাপ্ত হত না) কিন্তু রাসূল (সা.) এ কথা শুনেই দাঁড়িয়ে গেলেন এবং ঘোষণা করতে লাগলেন, তোমরা সবাই চল, জাবেরের বাড়ীতে তোমাদের খানার দাওয়াত।

তারা ছিলেন প্রায় (১০০০) এক হাজার লোক। আমি তো এ কথা শুনে জড়পদার্থের ন্যায় নিথর হয়ে গেলাম। বাকশক্তি যেন হারিয়ে ফেললাম। মনে মনে বলতে লাগলাম, হায় আল্লাহ! এখন কী উপায় হবে! এত লোকের খানা কি করে ব্যবস্থা করি। মান সম্মানতো যাবেই সাথে রাসূল (সা.)কেও ক্ষুধার্ত থাকতে হয় কি না!

এ দিকে রাসূল (সা.) আমাকে বলে রেখেছেন, যতক্ষণ আমি না আসব, চুলা হতে পাতিল নামাবে না। রুটিও পাকাবে না। অত:পর রাসূল (সা.) তাশরিফ আনলেন এবং পাতিলে থুথু মোবারক নিক্ষেপ করলেন। আর তাতে এত অধিক পরিমাণ বরকত হল যে, তরকারী তরঙ্গায়িত হতে লাগল আর আটা হতে বিরতিহীনভাবে রুটি বৃদ্ধি পেতে লাগল। আল্লাহর কসম! (আমার নিজের চোখ দেখা ঘটনা) যে এক হাজার লোক সবাই তৃপ্তি সহকারে খেয়ে চলে গেল। পাতিলে তরকারী যা ছিল, তাই রয়ে গেল। একটি রুটিও কম বলে মনে হল না। (সুবহানাল্লাহ!)

(বুখারী ৫৮৯/২)

(৪) হযরত জাবের (রাযি.) বলেন, রাসূল (সা.)-এর নিকট এক দরিদ্র লোক এসে খানা চাইল। রাসূল (সা.) তাকে প্রায় আধা ওসক জব প্রদান করলেন। সে এবং তার স্ত্রী এমনকি যত মেহমান আসত, তারা পর্যন্ত এর থেকে নিয়ে খেতে থাকল,

কিন্তু জব আর কমে না। এক দিন সে এই জবগুলিকে মেপে দেখল যে, কতটুকু কমল, আর কতটুকু রইল। এরপর যখন রাসূল (সা.)-এর নিকট এসে বলল, তখন রাসূল (সা.) তাঁকে বললেন, যদি তুমি তা ওজন না করতে, তাহলে অনির্দিষ্ট কাল পর্যন্ত তোমরা তা হতে জব খেতেই থাকতে, একটুও কম হত না।

(মুসলিম ২৪৬/২)

(৫) হযরত আবু হুরাইরা (রাযি.)-এর নিকট একটি থলে ছিল, যার মধ্যে অল্প কিছু খেজুর ছিল, (আনুমানিক দশটার মত হবে)। রাসূল (সা.) তাঁকে বললেন, তোমার নিকট খাওয়ার মত কিছু আছে কি? তিনি বললেন, অল্প কিছ খেজুর আছে এই থলেতে। তখন রাসূল (সা.) স্বীয় হস্ত মোবারক দ্বারা থলে থেকে কয়েকটি খেজুর বের করে ছড়িয়ে দিলেন আর দোয়া করে দিয়ে বললেন, দশজন করে লোক ডেকে নিয়ে আস এবং খাওয়াতে থাক। এভাবে করতে করতে সকল লোকদের জন্য এই অল্প খেজুর যথেষ্ট হয়ে গেল। আর যা অবিশষ্ট থাকল, তা আবু হুরাইরাকে দিয়ে বললেন, এই থলে হতে খেজুর বের করতে থাক, আর খেতে থাক। আর মনে রেখ! এই থলেটা কখনো উল্টে ঝেরে ফেল না। আবু হুরাইরা (রাযি.) সর্বদা এই থলে হতে নিয়ে খেতে থাকতেন। তিনি নিজেই বলেন, রাসূল (সা.) যতদিন দুনিয়ায় বর্তমান ছিলেন, ততদিন এই থলে হতে নিয়ে নিয়ে খেতাম। এরপর আবু বকর (রাযি.)-এর যুগে এরপর ওমর (রাযি.)-এর যুগে এরপর উসমান (রাযি.)-এর যুগেও খেলাম। কিন্তু হযরত উসমান (রাযি.)-এর শাহাদাতের ঘটনার পর এই থলেটা আমার হাত থেকে কে যেন ছিনিয়ে নিল। আর পেলাম না। তবে এর আগ পর্যন্ত এর থেকে যা খেলাম, আর যা দান সদকা করলাম, তা প্রায় কয়েক মন হবে। (সুবহানাল্লাহ!) (খাসায়েলে নববী ১৩২)

রাসূল (সা.)-এর পছন্দের সবজি ঃ

হযরত আনাস (রাযি.) বলেন, এক দরজি রাসূল (সা.)কে নিমন্ত্রণ করলেন, আমিও তাঁর সাথে সাথে ছিলাম। সে রাসূল (সা.)-এর সামনে জবের রুটি, কদু ও গোস্তের ঝোল উপস্থিত করল। আমি দেখলাম, রাসূল (সা.) পাত্রের চতুর্পার্শ্ব থেকে কদুর অংশগুলি খুঁজে খুঁজে খাচ্ছিলেন। এর পর থেকে আমার কাছেও কদু খুব পছন্দের বিষয় হয়ে গেল। (বুখারী ৮১৭/২)

এটা ছিল রাসূল (সা.)-এর প্রতি হযরত আনাস (রাযি.)-এর গভীর ভালবাসার নিদর্শন। ২য় বিষয় হল, এভাবে পাত্রের চারদিক থেকে হাত ঘুরিয়ে পছন্দের খানা খুঁজে খুঁজে নেয়া, তখনই সমীচিন হবে, যখন মেজবান তা অপছন্দ না করবে।

হযরত জাবের ইবনে তারেক (রাযি.) বলেন, আমি একদিন রাসূল (সা.)-এর

নিকট উপস্থিত হলাম। তিনি তখন কদু কেটে টুকরা টুকরা করছিলেন। আমি জিজ্ঞেস করলাম, এগুলি দ্বারা কি করা হবে। রাসূল (সা.) বললেন, তরকারীতে দেয়া হবে। (শামায়েলে তিরমিযী) এছাড়াও রাসূল (সা.) সিরকা খুব পছন্দ করতেন। (সিরকা বলা হয় আখ বা আংগুরের টক শরবতকে বা মজাদার চাটনি জাতীয় বস্তুকে) (ফ. জা ৪৯৮)

হযরত আয়েশা (রাযি.) বলেন, রাসূল (সা.) বলেন ঃ সিরকা খুবই চমৎকার তরকারী। (মুসলিম ১৮২/২)

হযরত জাবের (রাযি.) বলেন, রাসূল (সা.) একদিন আমার হাত ধরে তাঁর ঘরে নিয়ে চললেন। তাঁর সামনে রুটি টুকরা করে রাখা ছিল। তিনি বললেন, তরকাকারী কী আছে? বলা হল, অন্য কোন তরকারী তো নেই সামান্য কিছু সিরকা আছে। রাসূলুল্লাহ (সা.) বললেন, সিরকা তো অতি উত্তম তরকারী। হযরত জাবের (রা.) বললেন, তখন থেকে আমি সিরকা খুব পছন্দ করতে লাগলাম। হযরত তালহা ইবনে আনাস (রাযি.) বলেন, যখন এই হাদীস শুনলাম, তখন থেকে আমিও এই সিরকা খুব পছন্দ করতে লাগলাম। (মুসলিম ১৮২/২)

জয়তুনের তেলও রাসূল (সা.) তরকারী হিসাবে খেতে পছন্দ করতেন। ব্যবহারও করতেন। অন্যদেরও এর প্রতি উৎসাহিত করতেন।

হযরত ওমর (রাযি.) বলেন, তোমরা জয়তুনের তেল খাও এবং মালিশ হিসাবে ব্যবহার কর। কেননা, এটি অতি বরকতময় একটি বৃক্ষ হতে তৈরী হয়। (শামায়েলে তিরমিযী) জয়তুনের বৃক্ষকে মহান আল্লাহ পবিত্র কোরআনে বরকতময় বৃক্ষ বলে অভিহিত করেছেন। প্রিয় নবীজি (সা.) কখনও খেজুরের সাথেও রুটি খেতেন। হযরত ইউসুফ ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে সালাম (রা.) বলেন, আমি দেখলাম একদিন রাসূলুল্লাহ (সা.) একটি রুটিকে টুকরা করে এর উপর একটা খেজুর রাখলেন আর বললেন যে, এটা হল এর তরকারী অত:পর তা খেয়ে নিলেন। (শামায়েলে তিরমিযী)

এই হল বিশ্বনবী হযরত মুহম্মদ (সা.)-এর সাদাসিধে জীবন-যাপন। যখন যা পেতেন, তা খেয়েই তিনি জীবন কাটিয়ে দিতেন।

রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর অন্যান্য পছন্দনীয় খাদ্য-সামগ্রী ঃ

তিনি তরকারীর ঝোলে রুটির টুকরা চুবিয়ে খাওয়াকে পছন্দ করতেন। এটাকে সারীদ বলা হয় অতান্ত্য সুস্বাদু হজম সহায়ক খাদ্য। হযরত আনাস (রাযি.) বলেন, হযরত আয়েশা (রাযি.)-এর মর্যাদা অন্যান্য স্ত্রীগণের তুলনায় এমন; যেমন সারীদের মর্যাদা অন্য সব তরকারীর তুলনায় বেশি। (বুখারী ৮১৬/২)

অর্থাৎ অন্য সব খানার তুলনায় সারীদ যেমন বিশেষ গুনের কারণে আকর্ষণীয় হয়ে থাকে, তেমনিভাবে আয়েশার কিছু মহৎ গুনের কারণে সে আমার নিকট বিশেষ মর্যাদা ও আকর্ষণীয় হওয়ার দাবী রাখে। এখানে একটা কথা স্পষ্ট হওয়া দরকার যে, হযরত আয়েশা (রাযি.)-এর মর্যাদা বর্ণনা করার দ্বারা অন্য স্ত্রীগণের কোন অমর্যাদা করা হচ্ছে না। তাঁরাও প্রত্যেকে স্ব স্ব মহিমায় উজ্জল ছিলেন। যেমন হযরত খাদীজা (রাযি.)-এর মর্যাদা অন্যসব নারীদের তুলনায় শ্রেষ্ঠ প্রথম ইসলাম গ্রহণ করার জন্য ইত্যাদী আরও অনেক মহৎ গুনাবলীর কারণে। এমনিভাবে হযরত ফাতেমা সব নারীদের চেয়ে শ্রেষ্ঠ জান্নাতে সব নারীদের চেয়ে শ্রেষ্ঠ হওয়ার কারণে। এখানে হযরত আয়েশা (রাযি.) শ্রেষ্ঠ বা আকর্ষণীয় বলা হচ্ছে, তাঁর নিজস্ব কিছু মহৎ গুন ও প্রতিভার দিক লক্ষ্য করে। যেমন রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর আদরের স্ত্রী ছিলেন। তাঁকে কেন্দ্র করে উম্মতের অনেক বিষয় ওহী নাযিল হয়েছে। তাঁর ঘরে কখনও তাঁর কোলে শায়িত অবস্থায় রাসূলের উপর ওহী নাযিল হয়েছে। ইত্যাদী আরো অনেক কারণে। হযরত আয়েশা (রাযি.) বলেন, খাবার পর পাত্রে লেগে থাকা খাদ্যাংশ চেটে খাওয়াও তাঁর নিকট পছন্দের বিষয় ছিল। (শামায়েলে তিরমিযী)

একবার হযরত ইমাম হাসান ইবনে আলী (রাযি.) আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাযি.) এবং আবদুল্লাহ ইবনে জাফর (রাযি.) এই তিন তরুণ মিলে এক বৃদ্ধা সাহাবী হযরত সালমা (রাযি.)-এর নিকট উপস্থিত হলেন আর বলতে লাগলেন, যে খাদ্যদ্রব্য রাসূলুল্লাহ (সা.) খুব পছন্দ করতেন এবং আগ্রহের সাথে খেতেন, সে খানা আপনি পাকিয়ে আমাদেরকে খাওয়ান। সালমা (রাযি.) বললেন, ওহে আদরের ছেলেরা! সেই খানা কি তোমাদের কাছে ভাল লাগবে? তাঁরা সমস্বরে বলে উঠলেন, কেন নয়? অবশ্যই ভাল লাগবে। আপনি পাকিয়ে আমাদেরকে খাওয়ান। (যেহেত তারা আগ্রহের সাথে নবীজির পছন্দের খানা সর্ম্পকে জানতে গিয়েছিলেন, তাই খুব তাকিদ দিলেন)। অতপরঃ সেই বৃদ্ধা মহিয়ষী উঠলেন এবং অল্প কিছু জব নিয়ে সেগুলো পিষলেন এবং হাড়িতে রাখলেন এবং তাতে কিছু জয়তুনের তেলও ঢাললেন। আর কিছু মরিচ, জিরা ইত্যাদি মসল্লা ঢেলে খুব যত্ন করে পাকিয়ে রাখলেন আর বললেন যে, রাসূলুল্লাহ এই খানা খুব পছন্দ করতেন এবং আগ্রহ ভরে খেতেন।

(শামায়েলে তিরমিযী)

কবি মুযতার-এর বর্ণনা ঃ

ثرید و سرکہ اور میٹھی غذا محبوب رکھتے تھے ☆ کدو اور شہد کو اور زیت کو مرغوب رکھتے تھے

সারীদ ও সিরকা খেতেন মিষ্টি ছিল তার প্রিয় খাবার,

পছন্দ করতেন কিছু মধু জয়তুন ছিল অধিক প্রিয় খাবার তাঁর ।
রাসূল (সা.)-এর পানীয় সামগ্রী ঃ
হযরত আয়েশা (রাযি.) বলেন, তিনি মিষ্টি জাতীয় খাবার বিশেষ করে মধু তাঁর খুব প্রিয় ছিল । (বুখারী ৮৪০/২)
দুধও তাঁর খুব পছন্দের পানীয় ছিল । রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন, মি'রাজের সময় আমি যখন সিদরাতুল মুনতাহা নামক স্থানে পৌঁছলাম, তখন আমার সামনে তিনটি পান পাত্র উপস্থিত করা হল । একটাতে দুধ অন্যটাতে মধু আরেকটাতে শরাব (মদ) ছিল । আমি দুধের পাত্র নিয়ে দুধ পান করে ফেললাম । তখন আমাকে বলা হল যে, আপনি স্বভাবজাত বিষয়টিই গ্রহণ করেছেন । (বুখারী ৮৩৯/২)
রাসূল (সা.) ছাতু খেতেও পছন্দ করতেন । অধিকাংশ সময় জবের ছাতু আহার করতেন । একবার বাদামের ছাতু তাঁর সামনে প্রদান করা হলে তিনি তা গ্রহণ না করে বললেন, এটা তো রাজা বাদশাহদের খানা । এমনিভাবে মধু মিশ্রিত দুধও তিনি গ্রহণ করতেন না) । তিনি বলতেন দুধ, তরকারী এটাতো একত্রে ব্যয়বহুল । (এই অপব্যয় কী করে করব?) (খাসায়েলে নববী, লায়ল ও নাহার ৪০৯)
হযরত আয়েশা (রাযি.) বলেন, তিনি শীতল ও সুমিষ্ট পানীয় খুব পছন্দ করতেন । মিষ্টি জাতীয় পানীয় যেমন শরবত এবং খেজুর ভেজানো পানী এতে উভয়টাই বিদ্যামান আছে । হযরত আয়েশা (রাযি.) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর জন্য সুকইয়া নামক এলাকা হতে সুমিষ্ট ও সু-শীতল পানি সরবরাহ করা হত । সুকইয়া হল মক্কা ও মদীনার মধ্যবর্তী স্থান । মদীনা হতে দু'দিনের দূরত্বের পথ । এটা একটা চমৎকার পানির ঝরনা ছিল । মিঠা পানি দ্বারা উদ্দেশ্য হল লবণাক্ত পানি না হওয়া ।
(আবু দাউদ টিকা সহ ৫২৫/২)
মসজিদে নববীর সামনে হযরত তালহা (রাযি.)-এর সুন্দর একটি খেজুর বাগান ছিল । সে বাগানে বিরোহা নামে একটি কূপ ছিল, যার পানি ছিল খুবই সুপেয় । রাসূলুল্লাহ (সা.) সে বাগানে পানি পান করার জন্য চলে যেতেন । (বুখারী ৮৩৯/২)
কবি মুযতার বলেন ঃ

تھا آب سرد وشیریں بھی پسند خاطر عالی ☆ نہایت شوق سے کھانے کی کھرچن آپ نے کھالی

সুমিষ্ট ও সুশীতল ছিল যে তাঁর খুবই প্রিয়
আগ্রহ ভরে খেতেন তিনি যদি তা হত মিষ্টি জাতীয় ।
রাসূল (সা.)-যেভাবে পান করতেন ঃ
তিনি তিন শ্বাসে এভাবে পানি পান করতেন যে, প্রত্যেকবার পাত্রে মুখ মোবারক

লাগানোর সময় বিসমিল্লাহ বলতেন এবং মুখ মোবারক সরিয়ে নেওয়ার সময় আলহামদুলিল্লাহও বলতেন।
হযরত আনাস (রাযি.) বলেন, তিনি তিন শ্বাসে পানি পান করতেন। আর এভাবে পান করা ভাল এবং খুব তৃপ্ত হওয়া যায়। (বুখারী ৮৪১, শামায়েলে তিরমিযী)
চিকিৎসা শাস্ত্র মতেও এক নিঃশ্বাসে পানি পান করা খুবই ক্ষতিকর। বিশেষ করে শিরাতন্ত্রীকে দুর্বল করে দেয়। এমনিভাবে পেট ও হৃদপিন্ডের জন্য মারাত্মক ক্ষতিকর। আর পানি ডান হাতে পান করা উত্তম। কিন্তু দুঃখের বিষয় যে, বাম হাত দ্বারা পানাহারের ব্যাপক প্রচলন হয়ে গেছে এ যুগে। অথচ রাসূল (সা.) বলেছেন, তোমরা ডান হাতে পানাহার কর, কেননা বাম হাত দ্বারা শয়তান পানাহার করে থাকে। (মুসলিম ১৭৬/২)
আর বসে পান করা উত্তম। এটাই রাসূল (সা.)-এর প্রিয় অভ্যাস ছিল এবং সবাইকে এর প্রতি উৎসাহিত করতেন।
হযরত আনাস (রাযি.) বলেন, দাঁড়িয়ে পানাহার করা থেকে রাসূল (সা.) কঠোরভাবে নিষেধ করতেন। হযরত কাতাদাহ (রাযি.) বলেন, আমি হযরত আনাস (রাযি.)কে জিজ্ঞেস করেছিলাম, দাঁড়িয়ে পানাহার করার বিধান কী? তিনি বলেন, এটা অত্যন্ত ঘৃণিত ও নিকৃষ্ট কাজ। (মুসলিম ১৭৩)
তবে হ্যাঁ! কোন বিশেষ কারণে দাঁড়িয়ে পান করার অনুমতি আছে। যেমন যমযমের পাানি, ওযূর অবশিষ্ট পানি ইত্যাদি। (বুখারী ৮৪০/২)
আল্লামা শামী (রহঃ) কতিপয় মনীষীর কথা নকল করেছেন যে, ওযূর অবশিষ্ট পানি দাঁড়িয়ে পান করা রোগ-বালাই থেকে সুস্থ হওয়ার পরীক্ষিত আমল। (শামী ৮৮/১)
রাসূল (সা.) যমযমের পানি দাঁড়িয়ে পান করতেন যমযমের সম্মানার্থে। ইবনে আব্বাস (রাযি.) বলেন, তিনি যমযমের পানির পাত্রে মুখ লাগিয়ে দাঁড়িয়ে পান করতেন।
(বুখারী ৮৪০/২ মুসলিম ১৭৩/২)
কেউ কেউ কোন বুযুর্গের অবশিষ্ট পানিও দাঁড়িয়ে পান করাকে বরকতের মনে করে থাকে। অথচ এর কোন ভিত্তি নেই। রাসূল (সা.) কখনো অপারগ হয়েও দাঁড়িয়ে পান করেছেন; যেমনটা হযরত কাবশা (রাযি.) বলেছেন যে, রাসূল (সা.) একদা আমার ঘরে আগমন করলেন। মশক(চামড়ার বড় পানি রাখার পাত্র)টা ঘরের উঁচুতে বাঁধা ছিল, যা খুলা যায় না। রাসূল (সা.) তা থেকে মুখ লাগিয়ে পানি পান করেছেন। (শামায়েলে তিরমিযী)
একথা তো সবারই জানা যে, উপরে লটকানো কোন পাত্র থেকে পানি পান করতে হলে দাঁড়িয়েই করতে হবে। বসে করা তো সম্ভবই নয়। এই জন্য রাসূল (সা.)

দাঁড়িয়ে পান করেছেন। তবে আবু হুরায়রা (রাযি.) ইবনে আব্বাস (রাযি.) প্রমুখদের বর্ণনা মতে রাসূল (সা.) নিজেই পাত্রের মুখে মুখ লাগিয়ে পানি পান করতে নিষেধ করেছেন। (বুখারী ৮৪১/২) এই নিষেধাজ্ঞা আদব ও সতর্কতার জন্য ছিল।

কেননা এক ব্যক্তি একদা পাত্রের মুখে মুখ লাগিয়ে পানি পান করা অবস্থায় একটি সাপ বেরিয়ে এল। একথা যখন রাসূল (সা.) জানতে পেলেন, তখন এই নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছেন। (আল্লামা নববী (রহঃ) বলেন, এই নিষেধাজ্ঞার অর্থ হলো এভাবে পান না করা উত্তম। রাসূল (সা.) কাবশা (রাযি.)-এর ঘরে যে মুখ লাগিয়ে পানি পান করলেন, তা একথা বুঝানোর জন্য ছিল যে, এভাবে পান করাও জায়েয আছে একেবারে হারাম নয়। তথাপিও এভাবে পান না করাই উত্তম। এমন কি বদনার (লোটা) নালী দ্বারাও পানি পান করা ঠিক নয়। একবার (লেখক) আমি ছোট বেলায় বদনা দ্বারা ওযূ করতেছিলাম, পা ধোয়ার সময় হঠাৎ বদনার নালী থেকে একটি সাপের (ছোট) বাচ্চা বেরিয়ে এল। সাপের বাচ্ছাটা বের হতে আরেকটু সময় দেরী করলে আমিও ছোটদের স্বভাব সুলভ বদনার নালীতে মুখ লাগিয়ে পানি পান করতাম। আর তখন আল্লাহ না করুন আমার পেটেও চলে যেত ঐ সাপের বাচ্ছা। কিন্তু রাখে আল্লাহ মারে কে? আল্লাহ হেফাযত করেছেন, তবে এমনটা না করাই ভাল।

রাসূল (সা.)-এর অভ্যাস ছিল, যদি কোন সাথীদের সাথে কোন কিছু পান করতেন, তাহলে আগে সবাইকে পান করাতেন সবার শেষে নিজে পান করতেন আর বলতেন যে, সরবরাহকারী পরেই পান করে থাকে। (উসওয়ায়ে রাসূল- ১১৭)

তিনি কখনো পানি আর দুধ মিলিয়ে পান করতেন। আর যদি কোন মজলিস হত, তাহলে প্রথমে ডান দিক হতে পান করাতেন। হযরত আনাস (রাযি.) বলেন, রাসূল (সা.)-এর খেদমতে আমি পানি মিশ্রিত দুধ উপস্থিত করলাম। তাঁর ডান পার্শ্বে এক গ্রাম্য ব্যক্তি বসা ছিল আর বাম পার্শ্বে হযরত আবু বকর (রাযি.)। রাসূল (সা.) ডান পার্শ্বে অবস্থিত ঐ গ্রাম্য লোকটাকে আগে পান করতে দিলেন এরপর আবু বকর (রাযি)কে দিলেন। আর বললেন, ডান পার্শ্বের লোকের অগ্রাধিকার। (বুখারী ৮৪০/২)

উম্মতের কল্যাণে তিনি এ কথাও বলেছেন যে, কারও খানার পাত্রে যদি কোন মাছি বসে, তাহলে তার উচিৎ হলো পূরা মাছিটাকে ঐ পাত্রে ডুবিয়ে দেওয়া এরপর তা উঠিয়ে ফেলে দেয়া। এটা এজন্য করবে যে, মাছির বসার পর যে পাখাটা প্রথম খানার ভিতরে ডুবায় তার ভিতরে থাকে রোগ-বালাই আর অপর পাখায় থাকে উক্ত

তার ঝুলি থেকে মোটা ধরনের কাঠের একটি পান পাত্র বের করে দেখিয়েছেন, যার মধ্যে লোহার পাত লাগানো ছিল। আর বললেন যে, হে ছাবেত! এটা রাসূল (সা.) -এর পান করার পাত্র। হযরত আছেম (রাযি.) বলেন, এটা গভীর ও উত্তম ধরনের একটি পান করার পাত্র। বেশি লম্বা ছিল না এবং তা নাখার নামক বৃক্ষের কাঠ দ্বারা বানানো হয়েছিল এর রং ছিল হলুদ। হযরত আনাস (রাযি.) বলেন, আমি এই পাত্র দ্বারা রাসূল (সা.)কে যাবতীয় পানীয় সামগ্রী যেমন পানি, মধু, দুধ নবীয ইত্যাদি পান করিয়েছি। নবীয বলা হয়, খেজুর অথবা আঙ্গুর ভিজিয়ে রাখার পর পানিতে মিষ্টি মিষ্টি ভাব আসার পর তা পান করা।

আল্লামা মুহাম্মদ ইবনে সীরীন (রহঃ) বলেন, রাসূল (সা.)-এর পান করার পাত্রে লোহার পাত লাগানো ছিল। হযরত আনাস (রাযি.) এতে লোহার পাতের পরিবর্তে স্বর্ন অথবা রূপার পাত লাগিয়ে দিতে চেয়েছিলেন, তখন হযরত আনাস (রাযি.) এর পালক পিতা তা বারণ করলেন যে, রাসূল (সা.)-এর হাতের বানানোর পাতটাই বহাল থাকুক, তা পরিবর্তন করতে যেও না।
(বুখারী টিকা সহ ৮১২/২, শামায়েলে তিরমিযী)
এছাড়া রাসূল (সা.)-এর কাছে সিসার পাত্রও ছিল এবং তিনি কাঁচের, কাঠের, মাটি ও তামার পাত্রেও পানি পান করেছেন। (নববী লায়ন ও নাহার)
ফল খাওয়ার ব্যাপারে রাসূল (সা.)-এর প্রিয় অভ্যাস ঃ
হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে জা'ফর (রাযি.) বলেন, আমি রাসূল (সা.)কে দেখেছি যে, তিনি খেজুরকে ক্ষিরা ও শশার সাথে খেয়েছেন। (বুখারী ৮১৮/২)
হযরত বারী (রাযি.) বলেন যে, আমার চাচা হযরত মু'য়াজ ইবনে আফরা (রাযি.) খেজুর ভরা একটি পাত্র যার মধ্যে কচি কচি ক্ষিরাও ছিল রাসূল (সা.)-এর নিকট হাদিয়া পাঠালেন। আর ক্ষিরা রাসূল (সা.) এর অত্যন্ত প্রিয় ছিল। যখন তা নবীজির (সা.) সামনে পেশ করা হল। বাহরাইন থেকে পাঠানো কিছু অলংকারাদীও তখন রাসূল (সা.)-এর সম্মুখে ছিল। রাসূল (সা.) আমাকে সেখান থেকে এক মুষ্ঠি ভরে স্বর্ণ দিয়ে দিলেন। (শামায়েলে তিরমিযী)
রাসূল (সা.) ক্ষিরা ও খেজুর একত্রে খাওয়া খুব পছন্দ করতেন। কেননা, এর একটি গরম আর অপরটি ঠান্ডা, যাতে উভয়টার মধ্যে সামঞ্জস্যতা থাকে। এমনিভাবে হযরত আয়েশা (রাযি.) বলেন, রাসূল (সা.) তরমুজকে শুকনা খেজুর দ্বারা খেতেন। (এখানেও সামঞ্জস্যতা উদ্দেশ্য হত)। (শামায়েলে তিরমিযী)
হযরত আনাস (রাযি.) বলেন, রাসূল (সা.) বাঙ্গি ও খেজুর এক সাথে খেতেন কারণ বাঙ্গি সাধারণতঃ পানসে হয়ে থাকে আর খেজুর মিষ্টি। তাই দুটাকে মিলিয়ে খেতেন,

যাতে বাঙ্গি মিষ্টি লাগে। তিনি কখনো দুই ফল একত্রে খেতেন একটাকে একবার অন্যটাকে আরেকবার। এভাবে তিনি খেজুর ও বাঙ্গি এক সাথে খেতেন। খেজুর ডান হাতে আর বাঙ্গি বাম হাতে। তিনি খেজুরের বিচি বাম হাতের দুই আঙ্গুলের চিপায় রেখে তারপর ফেলে দিতেন (খাসায়েলে নববী, লায়ন ও নাহার ৪০৬)

নতুন ফল খাওয়ার ক্ষেত্রে রাসূল (সা.)-এর প্রিয় অভ্যাস ঃ
সাহাবাগণ প্রত্যেক মৌসুমের নতুন ফল এনে নবী করীম (সা.)-এর দরবারে উপস্থিত করতেন। আর রাসূল (সা.)-এর অভ্যাস ছিল, যখন কোন নতুন ফল তাঁর নিকট পেশ করা হত, তখন তিনি এটাকে ওষ্ঠ ও আঁখি যুগলের উপর রেখে এই দোয়া পড়তেন ঃ

অর্থ ঃ হে আল্লাহ! যেভাবে তুমি এই ফলের শুরুতে দেখিয়েছ এর শেষেও আমাদেরকে দেখাও। অত:পর তখন যদি রাসূল (সা.)-এর নিকট ছোট কোন শিশু বাচ্চা উপস্থিত থাকত, রাসূল (সা.) তাকে ঐ ফল প্রদান করতেন। (খাসায়েলে নববী ৪২৯)
খাওয়া-খাদ্যের ব্যাপারে অন্যান্য পবিত্র অভ্যাস ঃ
ইমাম দারামী (রহ.) স্বীয় হাদীস গ্রন্থে হযরত আয়েশা (রাযি.) হতে বর্ণনা করেন, যখন কোন গরম খাদ্য রাসূল (সা.)-এর নিকট আনা হত যতক্ষণ পর্যন্ত প্রচন্ড গরম হতে ঠান্ডা না হত, ততক্ষণ সেটাকে ঢেকে রাখতেন। হযরত আসমা (রাযি.) বলেন, আমি রাসূল (সাঃ) থেকে শুনেছি যে, খানা ঠান্ডা করে খাওয়ার মধ্যে অনেক বরকত। মাদারিজুন নবুওয়ত গ্রন্থে আছে, তিনি খানা খাওয়ারর পর তাৎক্ষণিক পানি পান করতেন না। কেননা এটা হজম শক্তির জন্য ক্ষতিকারক। খাদ্য-দ্রব্য যতক্ষণ হজমের কাছাকাছি পৌছে না যাবে, ততক্ষণ পানি পান করা উচিৎ নয়।
(উসওয়াসে রাসূল সা. ১১৪)
খানা খাওয়ার সময় এবং খানা খাওয়ার পরপরই অতিরিক্ত পানি পান করলে পাকস্থলী নষ্ট করে দেয়। খাওয়ার মধ্যখানে প্রয়োজন মোতাবেক পানি পান করা চাই। এরপর খানা শেষ হওয়ার কিছুক্ষণ পর যখন তার হজমের নিকটবর্তী হয়ে যাবে, তখন যতখুশি পানি পান করা যেতে পারে। চিকিৎসা বিজ্ঞানীদের মতে কমপক্ষে আধা ঘন্টা পর পানি পান করা চাই। খানা খাওয়ার পর রাসূল (সা.) কুলি করতেন এবং ভিজা হাতটা মুখমন্ডল ও মাথায় মুছে নিতেন। (বুখারী ৮২০/২)
তিরমিযি শরীফে বর্ণিত আছে, তিনি রাতের খানা অবশ্যই খেতেন, যদিও তা কয়েকটি খেজুরই হত না কেন। আর বলতেন যে, রাতের খানা অবশ্যই খাবে, তা যত অল্প পরিমাণেই হোক না কেন। কেননা রাতের খানা না খেলে মানুষ বার্ধক্যে উপনীত হয়ে যায়। (তিরমিযী ৭/২ খানা অধ্যায়)

হযরত আবু হুরায়রা (রাযি.) বলেন, তিনি খাদ্য-দ্রব্যে কোন দোষ-ত্রুটি বের করতেন না। যদি খানা খাওয়ার ইচ্ছা হত, তখন খেয়ে নিতেন আর যদি মনে না চাইত, তাহলে খেতেন না। তবুও খানার দোষ বের করতেন না। (বুখারী ৮১৪/২)
হযরত ইবনে আব্বাস (রাযি.) বলেন, রাসূল (সা.) যখন কোন নতুন খানা দেখতেন, যতক্ষন পর্যন্ত সেই খাদ্য-দ্রব্যের নাম না জানতেন, ততক্ষণ এর প্রতি হাত বাড়াতেন না।
(বুখারী ৮১২/২)
দাওয়াত খাওয়ার ব্যাপারে রাসূল (সা.)-এর প্রিয় অভ্যাস ঃ
যদি কোথাও রাসূল (সা.)-এর দাওয়াত হত, আর যদি কেউ বলা ছাড়াই রাসূল (সা.)-এর সাথে সাথে যেতে থাকত, তাহলে তাকে সাথে নিয়ে যেতেন কিন্তু নিমন্ত্রণকারীর বাড়ীতে গিয়ে তার জন্য অনুমতি নিতেন। যদি অনুমতি পাওয়া যেত, তাহলে উক্ত ব্যক্তিকে সাথে নিয়ে ভিতরে খানার দস্তরখানে উপস্থিত হতেন। তা না হলে তাকে সাথে নিতেন না।
হযরত আবু মাসঊদ (রাযি.), যার মূল নাম ছিল উকবা বিন আমর (রাযি.)। তিনি ঐতিহাসিক বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী একজন আনসারী সাহাবী। তিনি বর্ণনা করেন, আবু শুয়াইব নামক এক আনসারী সাহাবী রাসূল (সা.)-এর নিকট উপস্থিত হলেন। ঐ মুহূর্তে রাসূল (সা.) কয়েকজন সাথীবর্গের সাথে বসা ছিলেন। আবু শুয়াইব অনুভব করল রাসূল (সা.) ক্ষুধার্ত। তার একটি গোলাম ছিল, সে গোস্ত বিক্রি করত। তিনি তাকে খবর পাঠালেন যে, তুমি পাঁচজন লোকের খাবারের ব্যবস্থা কর। কেননা, রাসূল (সা.) ক্ষুধার্ত অবস্থায় আছেন এবং তাঁর সাথে আরও পাঁচজন। নির্দেশ মোতাবেক যথারীতি খানা প্রস্তুত হয়ে গেল। রাসূল (সা.) সাহাবাগণসহ আবু শুয়াইবের বাড়ীতে যেতে লাগলেন। তখন এক ব্যক্তি এসে শরীক হল, যে প্রথম থেকে তাঁদের সাথে ছিলেন না। রাসূল (সা.) আবু শুয়াইবকে লক্ষ্য করে বললেন, দেখ আরো একজন কিন্তু আমাদের সাথে আছে। তুমি ইচ্ছা করলে তাকে অনুমতি দিতে পার আর ইচ্ছা না করলে নাও দিতে পার। সাহাবী বললেন, কেন নয় আমি অবশ্যই তাকে অনুমতি দিলাম। (বুখারী)
হযরত জাবের (রাযি.) বলেন, নবী করীম (সা.) বলেন, যখন কাউকে দাওয়াত দেওয়া হয়, তখন সেথায় উপস্থিত হওয়া উচিৎ। এরপর যদি মনে চায় খাবে আর যদি মনে না চায় খাবে না। (সেটা ভিন্ন কথা) হযরত ইবনে ওমর (রাযি.) বলেন, কাউকে দাওয়াত দেওয়া হল অথচ সে উপস্থিত হল না, সে আল্লাহ ও তাঁর প্রিয় রাসূলের নাফরমানী করল। কোন কোন বর্ণনায় আছে যে, ওলীমার দাওয়াতে অবশ্যই উপস্থিত হওয়া উচিৎ। (আবু দাউদ ৫২৫/২) অর্থাৎ খানায় শরীক হোক

চাই না হোক নিমন্ত্রণকারীর বাড়িতে যাওয়া উচিৎ। যদি না যায়, তাহলে নিমন্ত্রণকারী মনে কষ্ট পাবে। আর কারো মনে কষ্ট দেওয়া ঠিক নয়। তবে হ্যাঁ কোন বিশেষ সমস্যার কারণে যেতে না পারলে, সেটা ভিন্ন কথা। আর সমস্যা হলে তখন তাকে জানিয়ে দেবে যে, ভাই আমি এই সমস্যার কারণে আসতে পারি নাই। আবু দাউদ শরীফে আছে, যদি দুই ব্যক্তি একই সাথে দাওয়াত দিতে আসে, তাহলে যার দরজা তোমার দরজার বেশি নিকটবর্তী সে অগ্রাধিকার পাবে। আর যদি উভয়ের দরজা সমান দূরত্বে হয়, তাহলে যে প্রতিবেশী হিসাবে বেশি নিকটবর্তী হবে, সে অগ্রাধিকার পাবে। আর যদি একজন আগে আসে, তাহলে তারটা গ্রহণ হবে। (আবু দাউদ ৫২৭/২)

রাসূল (সা.) বলেছেন, সর্বাধিক নিকৃষ্টতম খাবার হল ঐ খানা, যার মধ্যে শুধু অভিজাত শ্রেণীকে দাওয়াত করা হয় আর গরীবদেরকে তাড়িয়ে দেওয়া হয়। আর যে দাওয়াত কবুল করল না, সে যেন আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের নাফরমানী করল।
(বুখারী শরীফ ৭৭৮/২)

মেহমানের সাথে প্রিয় নবীজির আদর্শ ঃ

মেহমানদেরকে খানা খাওয়ানোর ব্যাপারে রাসূল (সা.) খুব খেয়াল করতেন এবং বার বার খেতে বলতেন। বুখারী শরীফে বর্ণিত হয়েছে একবার এক মেহমান ব্যক্তিকে দুধ পান করার জন্য বার বার বলতেছিলেন যে, আরও পান কর, আরও পান কর। অত:পর সে কসম খেয়ে বলতে লাগল, যে ইয়া রাসূলাল্লাহ! আর এক ফোটাও পান করার মত আমার পেটে জায়গা নেই। (উসওয়ায়ে রাসূল সা. ১১৪)
মেশকাত, ইবনে মাজাহ ইত্যাদি হাদীস গ্রন্থে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ (সা.) যখন লোকদের সাথে খানা খেতেন, তখন সবার শেষে তিনি দস্তরখানা থেকে উঠতেন। কারণ কেউ হয়তো এমনও আছে, যে ধীরে ধীরে খানা খেতে অভ্যস্ত। সবাই উঠে গেলে সে লজ্জায় কম খেয়েই উঠে যাবে আর ক্ষুধায় কষ্ট পাবে। এই জাতীয় লোকদের প্রতি খেয়াল করত: রাসূল (সা.) ধীরে ধীরে খেতে থাকতেন এমনকি সবার শেষে খানা থেকে ফারেগ হতেন।

হযরত আনাস (রাযি.) বলেন, প্রিয় নবীজি (সা.)-এর দস্তরখানে সকাল সন্ধ্যায় কখনো রুটি আর গোস্ত একত্রে আসার সুযোগ হত না। তবে মেহমানদের সাথে হলে আসত। (শামায়েলে তিরমিযী) অর্থাৎ যদি নবীজির ঘরে কোন মেহমান হতেন, তখন তাঁর খাতিরে দারিদ্র্যতা সত্ত্বেও রুটি ও গোস্ত একত্রে মেহমানের সামনে উপস্থিত করতেন। তা না হলে সাধারণত: সব সময় পেট পুরে খানা খাওয়া সম্ভব হত না।

হযরত আবু শুরাইহ শা'বী (রাযিঃ) বলেন, রাসূল (সা.) বলেছেন, যে ব্যক্তি আল্লাহ ও কিয়ামত দিবসের উপর ঈমান রাখে অর্থাৎ সে যদি মুমিন হয়, তাহলে সে যেন মেহমানের কদর করে। প্রথম একদিন একরাত মেহমানের মেহমানদারী জায়েয তথা নিরীক্ষণ হিসেবে খুব আদর যত্ন করবে, উত্তম খাবার-দাবারের ব্যবস্থা করবে। আর তিনদিন তিনরাত পর্যন্ত মেহমানদারী করবে। তথা যা উপস্থিত থাকে তাই খাওয়াবে। এর পরও যদি সে থাকে, তাহলে সদকা হিসেবে করবে তথা পরিবারের খানার পর অতিরিক্ত যা থাকবে, তা তাকে খেতে দিবে। তবে মেজবানের বাড়ীতে দীর্ঘদিন অবস্থান করে মেজবানকে কষ্টের মধ্যে ফেলে দেয়া মেহমানের জন্য জায়েয নয়। এর আগেই চলে যাওয়া উচিত। (বুখারী ৯০৬/২)

খানার শুরু ও শেষে আল্লাহর নাম স্মরণ করা ঃ

রাসূল (সা.) যখন লোকমা উঠাতেন, তখন বলতেন "ইয়া ওয়াসিআল মাগফিরাতি" খানা যখন সামনে উপস্থিত হত, তখন বলতেন ঃ

اللهم بارك لنا فی ما رزقتنا وقنا عذاب النار

আল্লাহুম্মা বারিক লানা ফীমা রাযাকতানা ওয়াকিনা আযাবান্নার। (খাসায়েলে নববী সা. ৪০৮)

হযরত আয়েশা (রাযি.) বলেন, কেউ যদি খানার শুরুতে বিস্‌মিল্লাহ পড়তে ভুলে যায়, তাহলে খানার মাঝখানে যখনই স্মরণ হবে, তখনই بسم الله اوله وآخره পড়ে নিবে। হযরত আয়েশা (রাযি.) বলেন, রাসূল (সা.) একদা ছয়জন লোকের সাথে খানা খাচ্ছিলেন। এমন সময় এক গ্রাম্য ব্যক্তি এসে মাত্র দুই লোকমাতেই সবটুকু খেয়ে ফেলল। তখন রাসূল (সা.) বললেন, সে যদি বিসমিল্লাহ পড়ে খানা খেত, তাহলে এই খানা সবার জন্যই যথেষ্ট হত। (শামায়েলে তিরমিযী) অর্থাৎ সে বিস্‌মিল্লাহ না পড়াতে শয়তান এতে শরীক হয়ে গেছে আর এই বে-বরকতীটা হয়ে গেল।

হযরত আনাস (রাযি.) বলেন, রাসূল (সা.) বলেছেন, আল্লাহ তা'আলা বান্দার ঐ কথায় খুব সন্তুষ্টি প্রকাশ করে থাকেন, যখন সে এক লোকমা খানা খায় অথবা এক ঢোক পানি পান করে আর আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করে। অর্থাৎ প্রতি লোকমা খানা ও প্রতি ঢোক পানি পান করার মুহূর্তে আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করতে থাকলে আল্লাহ তাকে খুব পছন্দ করেন।

হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রাযি.) বলেন, রাসূল (সা.) খানা শেষে এই দোয়া পড়তেন ঃ

الحمد لله الذی اطعمنا وسقا نا وجعلنا من المسلمين

"আলহামদুলিল্লাহিল্লাযী আত্বআমানা ওয়াসাকানা ওয়াজ আলানা মিনাল মুসলিমীনা।" আর যদি কারো বাড়ীতে দাওয়াত খেতেন, তাহলে খানা শেষে এই দোয়া পড়তেন ঃ

اللهم بارك لهم فيما رزقنهم واغفرلهم وارحمهم

“আল্লাহুম্মা বারিক লাহুম ফী মা রাজাক না হুম ওয়াগফির লাহুম ওয়ার হামহুম” ।

রাসূল (সা.) যেভাবে ইবাদত করতেন

প্রিয়নবী (সা.)-এর প্রতিটি কাজ, উঠা-বসা, নড়াচড়াই ছিল ইবাদত । তাঁর প্রতিটি কথা জিকির তাঁর চুপ থাকাটাও উম্মতের ফিকিরের জন্যই হত । তথাপি উদাহরণ স্বরুপ কয়েকটি ইবাদতের বিবরণ দেয়া হল, যাতে উম্মতের জন্য তা মাইল ফলক হিসেবে থাকে । আর যাতে সম্মক ধারণা লাভ করতে পারে যে, নবীজি (সা.) তাঁর প্রভুর ইবাদতে কী পরিমাণ নিমগ্ন থাকতেন ।

রাসূল (সা.)-এর নামায পড়ার নিয়ম ঃ

হযরত মুগীরা (রাযি.) বলেন, রাসূল (সা.) এত প্রচুর পরিমাণ নফল নামায পড়তে থাকতেন যে, দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে তাঁর পা মোবারক ফুলে যেত । কেউ জিজ্ঞেস করলেন, আপনি মহান প্রভুর পক্ষ হতে ক্ষমাপ্রাপ্ত, নিষ্পাপ হওয়া সত্ত্বেও এত প্রচুর পরিমাণ নামায কেন পড়েন? রাসূল (সা.) বলেন, “এই ক্ষমাপ্রাপ্ত হওয়ায় আমি কি তাঁর শুকরিয়া আদায় করব না?” (বুখারী ১৫২/১)

আমাদের ফরজ নামাযগুলি কত যে ভুলে ভরা, তাতো আমাদের ভালই জানা আছে । এমতাবস্থায় নফল নামায আরও বেশি বেশি গুরুত্ব সহকারে পড়া কি দরকার নয়? কেননা শেষ বিচারের দিনে ফরযের দুর্বলতাগুলি নফল নামায দ্বারা পুরণ করা হবে । আর সে দিনটা কতই না কঠিন হবে । আর এখন আমাদের সাথে দুই গোয়েন্দা তো লাগাই আছে । শুধু কি তাই! আমাদের প্রত্যেকটি অংগ-প্রত্যঙ্গ সেদিন আমাদের বিরুদ্ধে সাক্ষী দিতে থাকবে । সে দিন কি উপায় হবে? আল্লাহ তা‘আলা আমাদের হেফাজত করুন ।

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসঊদ (রাযি.) বলেন, আমি রাসূল (সা.)-এর সাথে এক রাতে নামাযে দাঁড়ালাম, তিনি ক্বেরাত এত দীর্ঘ করতে লাগলেন যে, আমার ধৈর্যচ্যুতি ঘটল এবং আমি খারাপ কিছুর চিন্তা করতে লাগলাম, তাঁর ছাত্ররা জিজ্ঞেস করলো যে “কী খারাপ চিন্তা করছিলেন?” ইবনে মাসঊদ (রাযি.) বললেন, “নামায ছেড়ে দিয়ে বসে পড়ার ।” (বুখারী ১৫৩/১)

কবি মুযতার এর বর্ণনা মতে ঃ☆

نوافل سے شغف اور اس کی کثرت اتنی فرماتے   قیام لیل میں پائے مبارک ورم کر جاتے

নফল এত পড়তেন অধিক যেন প্রভুর প্রেমে হারিয়ে যেতেন,
পা মোবারক ফুলে যেত, তবু নামায চালিয়ে যেতেন ।

রাসূল (সা.)-এর সুন্নত নামাযসমূহ ঃ

হযরত নোমান ইবনে সালেম আমর ইবনে আউস থেকে বর্ণনা করেন, আমর ইবনে আউস আম্বাসা থেকে তিনি উম্মে হাবিবা (রাযি.) হতে বর্ণনা করেন, হযরত উম্মে হাবীবা (রাযি.) বলেন, রাসূল (সা.) বলেছেন, যে ব্যক্তি দিন রাতে বার রাকাত সুন্নত নিয়মিতভাবে আদায় করবে, আল্লাহ তা'আলা তাঁর জন্য জান্নাতে একটি ঘর নির্মাণ করবেন। হযরত উম্মে হাবীবা (রাযি.) বলেন, যখন থেকে আমি এই হাদীস শুনলাম, আজ পর্যন্ত এই বার রাকাত ছাড়ি নাই। হযরত আম্বাসা (রাযি.) বলেন, আমি যখন উম্মে হাবীবা (রাযি.) থেকে এই হাদীস শুনলাম, আজ পর্যন্ত এই বার রাকাত ছাড়ি নাই। হযরত আমর ইবনে আউস (রহঃ) বলেন, যখন থেকে এই হাদীস আমি আম্বাসা (রহঃ) থেকে শুনলাম, আজ পর্যন্ত এই বার রাকাত ছাড়ি নাই। হযরত নোমান (রহঃ) বলেন, আমি যখন থেকে আমর ইবনে আউস (রহঃ)-এর নিকট হতে এই হাদীস শুনলাম, আজ পর্যন্ত এই বার রাকাতের আমল ছাড়ি নাই। (মুসলিম ২৫১/১)

আল্লাহ তা'আলা আমাদের সবাইকে এই বার রাকাত নামাযের আমল নিয়মিত করার তৌফিক দান করুন। আমীন।

উল্লেখিত এই বার রাকাত নামায যার আলোচনা করা হল, সে গুলি হলো সুন্নাতে মুয়াক্কাদাহ। এগুলি পড়া জরুরী। এই বার রাকাত নামায কোন্ কোন্ সময় পড়তে হয়? এর বিস্তারিত বিবরণ হযরত আয়েশার (রাযি.)-এর হাদীসে পাওয়া যায়। হযরত আয়েশা (রাযি.) বলেন, রাসূল (সা.) যোহরের পূর্বের চার রাকাত সুন্নাত নামায আমার ঘরে পড়তেন এরপর মসজিদে গমন করতেন এবং জামাতের সাথে ফরয নামায পড়তেন। এরপর আমার ঘরে আসতেন এবং দুই রাকাত সুন্নত পড়তেন। এমনিভাবে মাগিরবের ফরয নামায পড়ানোর পর আমার ঘরে এসে দুই রাকাত সুন্নত নামায পড়তেন। এমনিভাবে এশার ফরয নামায পড়ানোর পর ঘরে এসে দুই রাকাত সুন্নত পড়তেন এবং সুবহে সাদিক হওয়ার পর (ফজরের সময়) দুই রাকাত সুন্নত নামায আদায় করে মসজিদে গমন করত: ফজরের ফরয নামায পড়তেন। (আবু দউদ শরীফ ১৭৮/১)

এই সুন্নতগুলি ছাড়াও চার রাকাত সুন্নত এশার পূর্বে ও চার রাকাত আছরের পূর্বে রয়েছে, তবে সেগুলি হল গায়রে মুয়াক্কাদাহ। (নফল সমতুল্য)।

হযরত ইবনে ওমর (রাযি.) বলেন, রাসূল (সা.) বলেছেন, আল্লাহ তা'আলা ঐ ব্যক্তির উপর রহম করেন, যে আছরের ফরযের পূর্বে চার রাকাত সুন্নত আদায় করে। (তিরমিযী শরীফ ৭৮/১)

প্রিয়নবীর (সা.) পবিত্র যবানে বর্ণিত এই দোয়ার গুরুত্ব কত? মাত্র চার রাকাত নামাযের দ্বারা তা হাসিল হয়! আল্লাহ তা'আলা আমাদের সকলকে এই রহম দান করুন। আমীন।

রাসূল (সা.)-এর সুন্নত ও নফল নামায ঘরে পড়া ঃ

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে সা'দ (রাযি.) বলেন, আমি রাসূলকে (সা.) জিজ্ঞেস করলাম সুন্নত ও নফল নামায ঘরে পড়া উত্তম নাকি মসজিদে পড়া? রাসূল (সা.) বলেন, তোমরা কি দেখ না যে আমার ঘর মসজিদের কত নিকটবর্তী? এতদসত্ত্বেও আমি ফরয নামায ছাড়া বাকি সব নামায ঘরে পড়তে পছন্দ করি। (শামায়েলে তিরমিযী)

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রাযি.) বলেন, তোমরা ঘরেও কিছু নামায পড়, ঘরকে কবরস্থান বানিয়ে ফেল না। (বুখারী ১৫৮/১)

সুন্নত, নফল ইত্যাদি নামায ঘরে, মসজিদে উভয় স্থানে পড়া জায়েয আছে, তবে মসজিদে পড়ার তুলনায় ঘরে পড়াই উত্তম। কিন্তু যদি ঘরে গেলে, বিবি, বাচ্চা অথবা দুনিয়াবী অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে ব্যস্ত হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে, তাহলে মসজিদে পড়ে যাওয়াই উত্তম।

প্রিয়নবী (সা.)-এর তাহাজ্জুদ নামায পড়ার অভ্যাস ঃ

রাসূলে করীম (সা.) তাহাজ্জুদ নামায নিয়মিত পড়তেন। এমনকি কোন কোন উলামা বলেছেন যে, তাহাজ্জুদ পড়া রাসূল (সা.)-এর উপর ফরয ছিল। হযরত মাছরুক বলেন, আমি হযরত আয়েশা (রাযি.)-এর নিকট রাসূল (সা.)-এর তাহাজ্জুদ-এর অবস্থা জানতে চাইলাম যে, তিনি কিভাবে কখন তাহাজ্জুদ পড়তেন? হযরত আয়েশা (রাযি.) বলেন, ভোর প্রভাতে যখন মোরগের ডাক শোনা যেত, তখন তিনি তাহাজ্জুদের জন্য উঠে পড়তেন। (বুখারী শরীফ১৫২/১)

সাধারণতঃ রাতের শেষ ভাগে মোরগ ডাকতে আরম্ভ করত। আর রাসূল (সা.)-এরও পবিত্র অভ্যাস ছিল রাত অর্ধেক পার হয়ে যাওয়ার পর-ই তাহাজ্জুদের জন্য উঠে যাওয়া এবং তাহাজ্জুদ পড়া শেষে একটু শুয়ে আরাম করে নেওয়া।

হযরত আয়েশা (রাযি.) বলেন, নবী (সা.) সর্বদা-ই সেহরীর সময় শুয়ে পরতেন (বুখারী শরীফ ১৫২/১) অর্থাৎ তাহাজ্জুদ পড়ে শুয়ে যেতেন এবং ফজরের সময় উঠে যেতেন। হযরত আসওয়াদ (রহঃ) বলেন, আমি হযরত আয়েশা (রাযি.)-এর নিকট রাসূল (সা.)-এর তাহাজ্জুদ পড়ার নিয়ম জানতে চাইলাম। তিনি বললেন, রাতের প্রথমাংশে শুয়ে পড়তেন এবং ফজরের আগ মুহূর্তে আবার একটু শুয়ে আরাম করে নিতেন। মোয়াযযিন ফজরের আযান দিলে সাথে সাথে উঠে যেতেন এবং গোসলেন প্রয়োজন হলে গোসল সারতেন, তা না হলে ওযূ করে নামাযের জন্য চলে যেতেন। (বুখারী শরীফ ১৫৮/১)

রাসূল (সা.) তাহাজ্জুদের নামাযে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন রাকাত পড়তেন। এই জন্য এর সুনির্দিষ্ট কোন পরিমাণ ছিল না। যতটুকু সম্ভব হত পড়ে নিতেন। তবে হ্যাঁ এতটুকু পরিমাণে কষ্ট করা, যা সহ্য করার মত। এই জন্য এমন একটি পরিমাণ

অর্থাৎ লোকেরা যেহেতু সাধারণত: এই নিয়মটা-ই সর্বদা সহজভাবে পালন করতে পারে। আর কেউ যদি এর চেয়ে বেশি পড়ার অভ্যাস করে নিতে পারে, তাহলে আরও ভাল। যেমনটা মোল্লা আলী ক্বারী (রহঃ) ইমাম আবু হানীফা (রহঃ) হতে এর সর্বোচ্চ পরিমাণ নির্ধারণ করেছেন বার রাকাত।

রাসূল (সা.)-এর একটি পবিত্র অভ্যাস ছিল যে, তিনি বিতিরের নামায তাহাজ্জুদের পরে পড়তেন আর বলতেন যে, যার এই আশংকা হয় যে, সে শেষ রাতে উঠতে পারবে না, তাহলে সে যেন এশার পর পর-ই বিতির পড়ে নেয়। আর যার এই ভরসা আছে যে, সে উঠতে পারবে, তাহলে তার জন্য বিতির শেষ রাত্রে তাহাজ্জুদ পড়ে পড়াই উত্তম। (মুসলিম ২৫৮/১)

রাসূল (সা.) এর ইশ্‌রাক্ব ও চাশ্‌তের নামায পড়ার নিয়ম ঃ

রাসূল (সা.) বলেছেন, মানুষের তিন শত ষাটটি জোড়ার মধ্য হতে প্রত্যেকটির সদকাহ্‌ আদায় করা ওয়াজিব। আর চাশতের নামায হলো সমস্ত জোড়ার সদকাহ্‌।
(আবু দাউদ ১৮৩/১)

রাসূল (সা.) বলেন, যে ব্যক্তি ফজরের নামায আদায় করে স্বীয় স্থানে বসে থাকে আর অযথা কথা না বলে এর পর সূর্যোদয়ের পর ইশ্‌রাকের নামায পড়ে নেয়, আল্লাহ তা'আলা তার অতীত জীবনের সকল সগীরাহ গোনাহ মাফ করে দেন, যদিও তা সমুদ্রের ফেনা সমপরিমাণ হোকনা কেন। (আবু দাউদ ১৮২/১)

হযরত আলী (রাযি.) বলেন, সকাল বেলা যখন সূর্য্য পূর্ব দিগন্তে এতটুকু পরিমাণ উঠে যায়, যতটুকু পরিমাণ সন্ধ্যা বেলা মাগরিবের সময় থেকে আছরের নামাযের মধ্যে হয়ে থাকে। এই সময় রাসূল (সা.) দুই রাকাত নামায পড়তেন। এটা হলো ইশরাকের নামায। আর যখন সূর্য্যটা পূর্ব দিগন্তে অনেক উপরে উঠে যায়, যেমন মাগরিবের সময় হতে যোহরের নামাযের সময় এর মধ্যে হয়ে থাকে, তখন রাসূল (সা.) চার রাকাত নামায পড়তেন, এটা হলো চাশতের নামায। (শামায়েলে তিরমিযী) এশ্‌রাকের সময় দিনের প্রথম চতুর্থাংশ হয়ে থাকে। এর পর থেকে দুপুরের আগ পর্যন্ত চাশতের নামাযের সময়। আর এই নামাযের মধ্যেও রাসূল (সা.)-এর অভ্যাস বিভিন্ন রকম ছিল। মোটকথা হলো সর্বনিম্ন ২ রাকাত, সর্বোচ্চ বার রাকাত এর বেশি পড়া রাসূল (সা.) হতে প্রমাণিত নয়। তবে হ্যাঁ, অধিকাংশ সময় আট রাকাতই পড়তেন এই জন্য এই পরিমাণটা উত্তম।

হযরত উম্মে হানী (রাযি.) বলেন, রাসূল (সা.) মক্কা বিজয়ের দিন আমার ঘরে আগমন করলেন এবং গোসল করলেন এবং তাড়াতাড়ি আট রাকাত (চাশতের নামায) আদায় করলেন। তবে রুকু, সিজদা খুব ধীরস্থিরভাবে আদায় করলেন।
(বুখারী ১৫৭/১)

রাসূল (সা.) কোরআন তিলাওয়াত করতেন যেভাবে ঃ

হযরত কাতাদাহ (রহঃ) বলেন, আমি হযরত আনাস (রাযি.)কে জিজ্ঞেস করলাম, রাসূল (সা.) কিভাবে তিলাওয়াত করতেন? তখন আনাস (রাযি.) বলেন, মদ্দওয়ালা হরফগুলিকে খুব টেনে টেনে পড়তেন। (বুখারী ৭৫৪/২)

হযরত উম্মে সালমা (রাযি.) বলেন, রাসূল (সা.) তিলাওয়াত করার সময় প্রত্যেকটি আয়াতকে পৃথক পৃথকভাবে পড়তেন। এভাবে যেমন-الحمد لله رب العلمين

এরপর থেমে যেতেন এরপর الرحمن الرحيم পড়তেন। আবার থেমে যেতেন অতঃপর ما لك يوم الدين আবার থেমে যেতেন। অর্থাৎ এভাবে প্রত্যেকটি আয়াত থেমে থেমে সুন্দরভাবে তিলাওয়াত করতেন। (শামায়েলে তিরমিযী)

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মুগাফ্ফাল (রাযি.) বলেন, আমি রাসূল (সা.)কে মক্কা বিজয়ের দিন দেখলাম যে, তিনি তাঁর বাহনে আরোহণ করা অবস্থায় তিলাওয়াত করছেন "সুরায়ে ফাতাহ"। মুয়াবিয়া ইবনে কুবরা যিনি এই হাদীসের বর্ণনাকারী তিনি বলেন, লোকদের ভীড় লেগে যাওয়ার ভয় যদি না হত, তাহলে আমি রাসূল (সা.)-এর স্বরে কোরআন তিলাওয়াত করে শুনাতাম। (বুখারী শরীফ ৭৫৩/২, শামায়েলে তিরমিযী) আর তিনি কোরআন শরীফ আস্তে জোরে উভয় পদ্ধতিতেই তিলাওয়াত করতেন।

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে কায়েস (রহ.) বলেন, আমি হযরত আয়েশা (রাযি.)কে জিজ্ঞেস করেছিলাম, রাসূল (সা.) কিভাবে তিলাওয়াত করতেন? আস্তে নাকি জোরে? তিনি বললেন, উভয় পদ্ধতিতে তিলাওয়াত করতেন। আমি বলতাম, মহান আল্লাহ তা'আলার অশেষ করুনা ও কৃপা যে, তিনি আমাদেরকে সব ধরনের পড়ার সুযোগ-ই দান করেছেন। (শামায়েলে তিরমিযী) যদি অন্যদেরকে উৎসাহ প্রদান করা উদ্দেশ্য হয়, তাহলে কোরআন শরীফ জোরে পড়া উত্তম। আর যদি সেই সুযোগ না থাকে, যেমন লোকেরা ঘুমুচ্ছে অথবা নামায পড়ছে, তাহলে আস্তে পড়াই উত্তম।

রাসূল (সা.)-এর রোযা রাখার আলোচনা ঃ

হাদীসের গ্রন্থে রোযার অনেক ফজীলত বর্ণিত হয়েছে। আর রাসূল (সা.)-এর বাণীঃ জান্নাতে একটি (বিশেষ) দরজা আছে, যার নাম "রায়্যান"। এতে রোযাদার ব্যাতীত আর কেউ প্রবেশ করতে পারবে না । "রায়্যান" দরজা দ্বারা কেবল রোযাদারকেই আহবান করা হবে। আর সকল রোযাদারগণ এতে প্রবেশ করবেন, প্রবেশ করার সাথে সাথে এই দরজা বন্ধ করে দেওয়া হবে। (বুখারী শরীফ ২৫৪/১)

হযরত আনাস (রাযি.) বলেন, রাসূল (সা.) কোন মাসে এত অধিক পরিমাণে রোযা রাখতে থাকতেন, আমরা ধারণা করতাম যে, এই মাসে বুঝি আর রোযা

ভাংবেন না ।   (বুখারী ২৬৪/১)
রাসূল (সা.)-এর শাবান মাসে অধিক পরিমাণে রোযা রাখা ঃ
হযরত আয়েশা (রাযি.) বলেন, শা'বান মাস ব্যতীত অন্য কোন মাসে রাসূল (সা.)কে এত অধিক পরিমাণ রোযা রাখতে দেখি নাই । তিনি শা'বান মাসের বেশির ভাগ দিন রোযা রাখতেন ।
(বুখারী ২৬৪/১)
শা'বান মাসে অধিক পরিমাণে রোযা রাখার কারণ রাসূল (সা.) নিজেই বলেছেন যে, এই মাসে একটি এমন পুণ্যবান দিবসও আছে, যেদিন সারা বৎসরের আমল আল্লাহ তা'অলার সামনে উপস্থিত করা হয় । আমার মনটা চায় যে, আমি রোযা থাকা অবস্থায় আমার আমলগুলি আল্লাহর দরবারে উপস্থিত করা হোক । অন্য বর্ণনায় তিনি বলেন, এই মাসে (শাবান) যারা মৃত্যুবরণ করবে, তাদের সকলের নামের তালিকা তৈরী করা হয় । আমি চাই আমার মৃত্যুর তালিকাটা ঐ সময় তৈরী হোক, যখন আমি রোযা অবস্থায় থাকি ।   (খাসায়েলে নববী ২৫৪)
এক হাদীসে রাসূল (সা.) শাবান মাসে (শেষের দিকে) রোযা রাখতে নিষেধ করেছেন, যাতে রমাজানের ফরয রোযা রাখতে গিয়ে দূর্বল না হয়ে পড়ে । (এটা উম্মতের উপর সহানুভূতি প্রকাশ করার জন্য) কেননা, রাসূল (সা.)-এর উপর দূর্বলতার কোন নিদর্শন পরিলক্ষিত হত না । এই কারণে তিনি বিরতিহীনভাবে রোযা রাখতে থাকতেন । তবে অন্যদের প্রতি খেয়াল করতে গিয়ে শাবান মাসে রোযা রাখতে নিষেধ করেছেন । আহ্! দয়াল নবী আমাদের উপর কতভাবে দয়া করেছেন!
রাসূল (সা.)-এর প্রতি মাসে তিন দিন রোযা রাখার নিয়ম ঃ
প্রবিত্র কোরাআন শরীফে আল্লাহ তা'আলা ঘোষণা করেছেন ঃ

অর্থ ঃ "যে ব্যক্তি একটি পুণ্যের কাজ করবে, আল্লাহ তা'আলা তাকে তার প্রতিদান স্বরূপ দশ গুন বেশি পুণ্য দান করবেন" ।
এই আয়াতের ভিত্তিতে দশটি রোযা ত্রিশ রোযার সমান সাওয়াব-এর অধিকারী হয়ে গেল । তাই যে ব্যক্তি প্রতি মাসে তিনটা রোযা রাখবে, সে যেন সারা মাস রোযা রাখল । এমনিভাবে সে সারা জীবন রোযা অবস্থায়ই কাটিয়ে দিল । রাসূল (সা.) এটার খুব কদর করতেন এবং অন্যদেরকে এই তিনটা রোযা রাখার ব্যাপারে উৎসাহ প্রদান করতেন ।
হযরত মুয়ায (রাযি.) বলেন, আমি হযরত আয়েশা (রাযি.)-এর কাছ থেকে জানতে চাইলাম যে, রাসূল (সা.) কি প্রতি মাসে এই তিনটি রোযা রাখতেন? তিনি বললেন, হ্যাঁ তিনি রাখতেন । আমি বললাম, কোন তিন দিন? তিনি বলেন, এর কোন তারিখ নির্ধারিত ছিল না । যখন সুযোগ হত, তখন তিনি রোযা রাখতেন । যেহেতু রাসূল

(সা.)-এর পক্ষ হতে কোন তিন দিনের নির্ধারণকৃত ছিল না। কখনও মাসের প্রথম তিন দিন রোযা রাখতেন, কখনও চান্দ্র মাসের ১৩, ১৪, ১৫ তারিখ রাখতেন। আবার কখনও এমন করতেন যে, কখনও এক মাসের প্রথম শনি, রবি, সোম বারে রোযা রাখতেন। এর পরের মাসে মঙ্গল, বুধ, ও বৃহঃবার রোযা রাখতেন। যাতে সপ্তাহের সবগুলি দিনে রোযা রাখা হয়ে যায়।
(শামায়েলে তিরমিযী)
হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনে আস (রাযি.) বলেন, আমাকে রাসূল (সা.) বলেছেন যে, প্রতি মাসের তিন দিন রোযা রেখে নিও। কেননা, সব পুণ্যের প্রতিদান দশগুন প্রদান করা হয়। তাই এই প্রত্যেক মাসে তিন রোযা রাখা সারা বছর রোযা রাখার সমতুল্য হয়ে যাবে।
(বুখারী ২৬৫/২)
মহররমের দশ তারিখে রাসূল (সা.)-এর রোযা রাখা ঃ
হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাযি.) বলেন, রাসূল (সা.) যখন মদীনায় আগমন করলেন, তখন তিনি ইয়াহুদীদেরকে দেখলেন যে, তারা মহররমের দশ তারিখে রোযা রাখে। রাসূল (সা.) এর কারণ জিজ্ঞেস করলে তারা জবাব দিল যে, এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ দিন। এই দিনে আল্লাহ তা'আলা হযরত মুসা (আঃ)কে তাঁর জাতিসহ তাঁর চিরশত্রু ফেরাউনের কবল থেকে মুক্তি দিয়েছিলেন। আর ফেরাউনকে তার বাহিনীসহ সমুদ্রে নিমজ্জিত করেছিলেন। অতঃপর মুসা (আ.) এই দিনে শুকরিয়া হিসেবে রোযা রেখেছিলেন। আর আমরাও তাঁর অনুসরণ করতঃ এই দিনে রোযা রাখি। রাসূল (সা.) বললেন, আমরা তোমাদের তুলনায় মুসা (আঃ)-এর সাদৃশ্যতায় রোযা রাখার বেশি অধিকারী। অতঃপর রাসূল (সা.) নিজেও রোযা রাখলেন, সাহাবাগণকেও রোযা রাখার নির্দেশ প্রদান করলেন।
(বুখারী ২৬৮/১, মুসলিম ৩৫৯/১)
হযরত ইবনে আব্বাস (রাযি.)-এর অপর বর্ণনা মতে এই দিন খৃস্টানরাও রোযা রাখত, যেহেতু এই উভয় জাতি মাত্র একদিন (১০ তারিখ) রোযা রাখত, তাই রাসূল (সা.) এদের বিপরীত করার নির্দেশ দিয়েছেন আর বলেছেন যে, যদি আগামী বৎসর আমি বেঁচে থাকি, তাহলে ৯ তারিখ এবং ১০ তারিখ দুই দিন রোযা রাখব। ইবনে আব্বাস (রাযি.) বলেন যে, পরবর্তী বৎসর আসার আগেই তিনি আল্লাহর ডাকে সাড়া দিয়ে পরপারে চলে গেছেন। (মুসলিম ৩৫৯/১)
এই জন্য এখনও এটাই বিধান যে, কেউ যদি মুহাররমের রোযা রাখতে চায়, তাহলে সে যেন ১০ তারিখের আগে অথবা পরে ১ দিন এর সাথে মিলিয়ে রোযা রাখে, যাতে ইয়াহুদীদের সাথে সামঞ্জস্য না হয়।
হযরত আয়েশা (রাযি.) বলেন, রাসূল (সা.) মুহাররমের দশ তারিখের রোযা রাখার নির্দেশ প্রদান করতেন। তিনি নিজেও রাখতেন। এরপর রমাযানের রোযা

ফরয হয়ে গেল, তখন যার খুশি রাখত, যার খুশি রাখত না। (বুখারী ২৬৮/১) অর্থাৎ মুহাররমের রোযা রাখা ফরয হয়েছিল রমাযানের রোযা ফরয হওয়ার আগে। এরপর যখন রমাযানের রোযা ফরয হয়ে গেল, তখন এর ফরযিয়্যত রহিত হয়ে গেল। কেবল নফল হিসেবে বাকি থাকল এবং এক বৎসরের গোনাহের কাফ্ফারা হিসেবে রয়ে গেল। মুসলিম শরীফের বর্ণনা মতে মুহাররমের রোযা রাখার দ্বারা এক বৎসরের গোনাহ মাফ হয়ে যায়। এছাড়াও আরও অনেক বর্ণনায় এর ফজীলত বর্ণিত হয়েছে। (মুসলিম ৩৬৭/১)

Aviïivi dRxjZ KLb †_‡K?

হযরত শায়খুল হাদীস আল্লামা যাকারিয়া (রহঃ) হাদীসের বিভিন্ন ব্যাখ্যা গ্রন্থ হতে বর্ণনা করেন, আশুরাতো সেই মহিমান্বিত দিবস, যে দিন হযরত আদম (আঃ)-এর তওবা কবুল হয়েছিল। সেদিন নূহ (আঃ)-এর কিস্তী (জাহায) উপকূলে ভিড়ে ছিল। যেদিন ফেরাউন-এর কবল থেকে মুসা (আ.) তাঁর জাতিসহ মুক্তি পেয়েছিলেন এবং ফেরাউন সদলবলে নীল নদে ডুবে মরেছিল। যেদিন হযরত ঈসা (আঃ) পিতাবিহীন অলৌকিকভাবে জন্মলাভ করলেন এবং তাঁর জাতির তওবা কবুল করা হলো। এই দিনই তাকে উর্ধ্বাকাশে উঠিয়ে নেয়া হলো। এই দিনই হযরত ইউনুস (আ.) মাছের পেট থেকে মুক্তি পেলেন এবং তাঁর জাতির তওবা কবুল করা হলো। এই দিন ইউসুফ (আ.)কে কুপ থেকে উঠানো হয়েছিল। এই দিন হযরত আইউব (আ.)কে বিশেষ ব্যাধি থেকে আরোগ্য দান করা হলো। এই দিন হযরত ইব্রাহীম (আ.)কে আসমানে উঠিয়ে নেয়া হলো। এই দিন হযরত ইব্রাহীম (আ.)এর জন্ম হয়েছিল। এই দিন হযরত সুলাইমান (আ.) তাঁর হারানো সাম্রাজ্য ফিরে পেয়েছিলেন। আরো বলেন যে, এই দিনের গুরুত্ব অনুধাবন করত: হিংস্রপ্রাণীরা পর্যন্ত ঐ দিন পানাহার থেকে বিরত থাকে রোযা রাখে। অথচ আমরা মানুষ জাতি এমন একটি বরকতের দিন হেলায় খেলায় কাটিয়ে দেই। আফসোস! (খাসায়েলে নববী ২৫৮)

এছাড়া আরও অনেক ফজীলতের বিবরণ বিভিন্ন কিতাবে পাওয়া যায়। যেমন কিয়ামত (মহাপ্রলয়) সংঘটিত হবে এই দিনে। এ যুগের মুসলমানদের একটা ধারণা বা ভ্রান্ত বিশ্বাস জন্মে গেছে যে, ১০ই মহররম-এর যত ফজীলত সব কেবল কারবালার প্রান্তরে ইমাম হোসাইন (রাযি.)-এর শহীদ হওয়ার কারণে! এটা অত্যন্ত মুর্খতা ও অজ্ঞতার পরিচায়ক। একটা মনগড়া কথা ছাড়া আর কিছু নয়। ইসলামী জ্ঞান আলোকের দৃষ্টিতে তা ঠিক নয়। অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় হলো যে, ইমাম হোসাইনের শহীদ হওয়ার ঘটনাকে কেন্দ্র করে শুধু মুহররমের দশ তারিখই নয় বরং গোটা মুহররমের মাসটাকেই শোক ও মাতমের মাস বানিয়ে

ফেলা হয়েছে। অথচ আল্লাহর পথে শহীদ হওয়া তো কোন দুঃখজনক ঘটনা নয়, বরং প্রতিটি মুসলমানের পরম পাওয়া ও আশা আকাঙ্খার ফসল। মোটকথা, আমাদের উক্ত আলোচনা দ্বারা এটা স্পষ্ট হয়ে গেল যে, মুহররমের ফজীলত প্রিয়নবীজি (সা.)-এর জন্মের আরও অনেক পূর্ব থেকে প্রচলিত। তাই ঘটনাক্রমে এই তারিখে কারবালা প্রান্তরে ইমাম হুসাইনের (রাযি.) শাহাদাতের ঘটনাও ঘটে গেছে। যার দরুন এই দিনের ফজীলতটা আরও বেশি মহিমাযুক্ত হয়ে গেছে। কিন্তু এই দিনের ফজীলতটাকে শুধু ইমাম হুসাইননের (রাযি.)-এর শাহাদৎ-এর সীমাবদ্ধ করে দেয়া বোকামী ছাড়া আর কিছু নয়।

†Kvb Avgj wU ivm~j (mv.)-Gi AwaK cQ›`bxq wQj t

রাসূল (সা.)-এর নিকট ঐ আমলই সর্বাধিক পছন্দনীয় ছিল, যা অল্প হলেও নিয়মিত করা যেত। হযরত আবু সালেহ (রহঃ) বলেন, আমি হযরত আয়েশা (রাযি.) এবং উম্মে সালমা (রাযি.) উভয়ের নিকট জানতে চাইলাম যে, রাসূল (সা.)-এর নিকট কোন আমলটি সর্বাধিক প্রিয় ছিল? তারা উভয়েই আমাকে বললেন যে, যে আমল নিয়মিত করা যায়, তাই পছন্দনীয় ছিল। যদিও তা অল্প হোক না কেন।
(শামায়েলে তিরমিযী)

রাসূল (সা.) নিজেই বলেছেন, আল্লাহর নিকট ঐ আমল সর্বাধিক প্রিয়, যা নিযমিত করা হয়।
(বুখারী শরীফ ৮৭১/২)

যেহেতু ফরয আমলসমুহের ঘাটতি নফল আমল দ্বারা পূর্ণ করা হবে এই জন্য সবার উচিত ফরজের পাশাপাশি নফল ইবাদত বেশি বেশি করতে থাকা। হ্যাঁ ধারাবাহিকভাবে কোন আমল করতে থাকার মধ্যে অনেক বরকত আছে, যদিও তা অল্প পরিমাণের হোক। ধারাবাহিকতা অনেক বড় জিনিষ। ছোট্ট একটি আমলও নিয়মিত করতে থাকলে অনেক হয়ে যায়। নিয়মিত করতে থাকাটাই কামালিয়াত। এমন যেন না হয় যে এক দিন সারারাত নফল এবাদতে কাটিয়ে দিল। আরেক দিন এমন ঘুম ঘুমালো যে ফজরের ফরয নামাযই পড়ল না! এই জাতীয় ইবাদতের দ্বারা না ইবাদতের কোন মজা পাওয়া যায়। না এর দ্বারা কোন ফায়দা হয়। এই জন্য বুযুর্গ মনীষীগণ এ ব্যাপারে খুব সচেতন থাকেন যে, যদি কোন নিয়মিত অজিফা ছুটে যায়, তাহলে নির্ধিরিত সময় চলে গেলেও তা আদায় করে নিতেন। তা না হলে আমল ছেড়ে দেয়ার অভ্যাস বনে যাবে।

হযরত আয়েশা বলেন, যদি কোন বিশেষ ঝামেলার কারণে রাসূল (সা.)-এর রাতের তাহাজ্জুদ নামায ছুটে যেত, তাহলে দিনের বেলায় চাশতের সময় চার রাকাত পড়ে নিতেন।
(শামায়েলে তিরমিযী)

মুসলিম শরীফের একটি বর্ণনায় এসেছে রাসূল (সা.) বলেছেন, যদি কোন কারণে

রাতের আমল না করতে পার, তাহলে দিনের বেলায় তা দুপুরের পরে হলেও আদায় করে নিবে। তবুও রাতের বেলায় আদায় করার সওয়াব পাওয়া যাবে।

بہار اب جو دنیا میں آئی ہوئی ہے ★ یہ ٹہنی انہیں کی لگائی ہوئی ہے

বিশ্ব ব্যাপী ছড়িয়ে গেছে যে সৌরভের ফুল্লধারা
এসব তো তাঁর ই অবদান, যিনি লাগিয়ে গেলেন পুষ্প ডালা।

ivmj (mv.)-Gi ^ah¨ avi Y Kivi weeiY t

রাসূলে আকরাম (সা.) নিজেও ছিলেন ধৈর্য্যের এক মূর্তপ্রতিক। অন্যদেরকেও এর প্রতি উৎসাহ প্রদান করতেন। বুখারী ও মুসলিম উভয় হাদীস গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে যে, রাসূল (সা.) বলেছেন, যে ব্যক্তি ধৈর্য্য ধারণ করার চেষ্টা করবে, আল্লাহ তা'আলা তাকে ধৈর্য্য ধারনের ক্ষমতা দান করবেন। আর ধৈর্য্য ছাড়া যত ভাল আমল আছে সবগুলি একত্র করেও ধৈর্য্যের সমান প্রতিদান পাওয়া যাবে না।
(উসওয়ায়ে রাসূল ৪৫২)

মা'য়ারেফুল হাদীস গ্রন্থে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাযি.) হতে বর্ণিত আছে যে, নবী করীম (সা.) বলেছেন, যে বান্দা কোন দৈহিক ও অর্থনৈতিক সমস্যায় পড়বে আর সে কারো নিকট তা প্রকাশ করবে না এবং কারো নিকট এর কোন অভিযোগ করবে না, তাহলে আল্লাহ তা'আলা নিজ দায়িত্বে তার পাপরাশী ক্ষমা করে দিবেন। (উসওয়ায়ে রাসূল, মা'আরিফুল হাদীস ৪৫৩)

রাসূল (সা.) বলেন, মুমিনের দেহে যদি একটি কাঁটাও ফুঁটে, তাহলেও এর দ্বারা আল্লাহর নৈকট্যের এক ধাপ উন্নতি সে লাভ করে। আর একটি গোনাহ মাফ করে দেয়া হয়। এমনকি ঐ চিন্তা যা মুমিন বান্দাকে বিচলিত করে দেয়, এর দ্বারাও আল্লাহ তা'আলা মুমিনের গোনাহ মাফ করে দেন। (বুখারী ৮১৩/২ মুসলিম ১৯১/১)

মোটকথা, মানুষ দুই অবস্থায় থাকে দুনিয়াতে। হয়ত সে ভাল অবস্থায় থাকবে না হয় খারাপ অবস্থায়। যদি ভাল অবস্থায় থাকে, তাহলে শুকরিয়া আদায় করবে। আর যদি খারাপ অবস্থায় থাকে, তাহলে ধৈর্য্য ধারণ করবে। আর তার মাথায় যদি এই কথাটা বিদ্যামান থাকে, তাহলে তাকে হতাশার অনলে পুড়তে হবে না। সর্বদা সে চিন্তামুক্তভাবেই জীবন-যাপন করতে পারবে। রাসূল (সা.) বলেছেন. মুমিনের প্রত্যেকটি বিষয় কতই না চমৎকার কল্যাণকর। আর এই সৌভাগ্য মু'মিন ছাড়া আর কারো হবে না। কেননা মুমিন যদি ভাল অবস্থানে থাকে, তাহলে সে এর জন্য আল্লাহর নিকট শুকরিয়া আদায় করবে। তখন তার এই ভাল অবস্থা তার জন্য মঙ্গলজনক হয়ে গেল। আর যদি মু'মিন কোন কষ্টে পতিত হয় এবং এর উপর ধৈর্য্য ধারণ করে, তাহলে এই খারাপ অবস্থাও তার জন্য কল্যাণকর সাব্যস্ত হয়।

(রিয়াজুস সালেহীন ৯৭ উসওয়ায়ে রাসূল সা. ৪৫৩)
বান্দার শুকরিয়া জ্ঞাপন করাটা মঙ্গলজনক হয় এইভাবে যে, আল্লাহ তা'আলা বলেছেন ঃ

অর্থাৎ তোমরা যদি শুকরিয়া আদায় কর, তাহলে আমি তোমাদের নেয়ামত আরও বৃদ্ধি করে দিব। আর সবর ধৈর্য্য ধারন করা কল্যাণকর এভাবে হয় যে, এর দ্বারা নিজেকে আল্লাহর দায়িত্বে অর্পণ করে দেয়া এবং তার সমষ্টিতে অর্পন করে দেয়া লাজেম আসে, যা কিনা উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন নবীগণের স্থান। আল্লাহ তা'আলা ঘোষণা করেন ঃ

অর্থাৎ হে নবী! আপনি ধৈর্য্য ধারণ করুন, যেমনিভাবে উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন নবীগণ ধৈর্য্য ধারণ করেছেন। রাসূল (সা.) ধৈয্য ধারণ করা কোন মৃত ব্যক্তির উপর ঃ
হযরত আনাস (রাযি.) বলেন, রাসূল (সা.) ইউসুফ লোহার (রাযি.)-এর ঘরে গমন করলেন। ইউসুফ লোহার হলেন, রাসূল (সা.)-এর সন্তান ইব্রাহীম (রাযি.) -এর দুধপিতা। অর্থাৎ ইউসুফ (রাযিঃ)-এর স্ত্রী ইব্রাহীম কে দুগ্ধ পান করিয়ে ছিলেন। রাসূল (সা.) স্বীয় সন্তান ইব্রাহীম (রাযি.)কে কুলে তুলে নিলেন এবং চুম্বন করলেন এবং তাঁর নাকের সাথে রাসূল এর নাক মিলালেন (যেমনটা বাচ্চাদের আদর করার সময় করে থাকে) আবারও ইব্রাহীম (রাযি.) অসুস্থ হওয়ার খবর শুনে তাঁর বাড়ীতে গমন করলেন। কিন্তু ততক্ষণে ইব্রাহীম (রাযি.) মুত্যু শয্যায় উপনীত।
নিজ সন্তানের এই করুন অবস্থা দেখে রাসূল (সা.)-এর নয়নযুগল দ্বারা অশ্রু প্রবাহিত হতে লাগল। হযরত আব্দুর রহমান ইবনে আউফ তাঁর সাথেই ছিলেন। তিনি অবাক হয়ে বলতে লাগলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! একি! আপনি কাঁদছেন? রাসূল (সা.) বললেন, এই অশ্রু প্রবাহিত হওয়া কোন দোষনীয় নয়। এটা সোহাগ ও মমতার নির্দশন। রাসূল (সা.)-এর নয়নযুগল থেকে পুনরায় অশ্রু ঝরতে লাগল এবং মুখ থেকে এই বাণী নির্গত হল ঃ চোখ অশ্রু প্রবাহিত করছে। হৃদয় বেদনায় নীল হয়ে আছে। কিন্তু মুখে সে কথাই উচ্চারণ করব, যা আমার আল্লাহর নিকট পছন্দনীয়। হে ইব্রাহীম! আমরা তোমার বিয়োগ ব্যাথায় কাতর। (বুখারী ১৭৪/১ মুসলিম ২৫৪/২, তিরমিযী ১৯৫/১)
এ হলো রাসূল (সা.) এর সন্তান হযরত ইব্রাহীম (রাযি.)-এর তিরোধানের ঘটনা। যিনি তার বাদী মারিয়া ফিবতিয়া (রাযি.)-এর গর্ভে জন্মেছিলেন। মদীনার নিকটবর্তী কুবা নামক গ্রামে ইউসুফ লোহার-এর স্ত্রীর নিকট দিয়েছিলেন। তিনি